আর ঠিক সেই সময় শানবাঁধানো রাস্তায় কলের কলকাতাকে বিষম ঠাট্টা করে পিচঢালা রাস্তায় মেয়েলি গলায় কে যেন চেঁচিয়ে উঠল—মাট্টি লেবে গো মাটি।

মনে মনে আমি ভারি খুশি হই। কেমন জব্দ? কেমন?

আর আদিগন্ত মাঠ নয়, মাটির শুধু একটা ডেলার জন্যে আমার মনটা কেমন করে উঠল।

এমন যে নীরস শানবাঁধানো কলকাতা, তাকে কেমন করে একদিন ভালোবেসে ফেললাম—সে কথা আমার নিজেরই জানা নেই।

কানাগলির মোড়ে বাঁদিকের বাড়ির গায়ে ঝোলানো গ্যাসের টিমটিমে আলো। তার নীচে মিষ্টির দোকান। ডান হাতে কর্পোরেশনের ইস্কুল। তার সামনে বড়ো একটা রোয়াকে বুড়োদের আড্ডা। একটু এগিয়ে এক পা-কাটা দর্জির দোকান। ছেলে-ছোকরাদের আড্ডা সেখানে। পাড়ায় নানা রকমের লোকের বাস। কেউ ডাক্তার, কেউ কবিরাজ; কারো লোহালক্কড়ের, কারো সোনারুপোর দোকান; কেউ সওদাগরি অফিসে চাকরি করে, কেউ বাড়িভাড়ার টাকায় বসে খায়। ডাক্তারবাবুর সেজো ভাই রেলের ক্যানভাসার, কবিরাজ মশাইয়ের ছোটো ছেলে বিলেতফেরত। আড্ডিদের বাড়ির এক ছেলে টাকা জাল করে জেল খাটছে।

বিকেল হলে পাড়ার সব ছেলে ছাদে যায়। পাড়া কাঁপিয়ে শুধু একটা আওয়াজ ওঠে—ভোঁ-কাটা। একা আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই।

বউবাজারের মোড় থেকে এসপ্ল্যানেড অব্দি সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের দু-পাশে ফাঁকা জমি। মলঙ্গা লেনের কাছটাতে চিনেদের থিয়েটার। এদিক ওদিক দু-একটা পাঁউরুটি তৈরির কারখানা। এক জায়গায় রিক্সার ওপর বসে এক সন্ন্যাসিনী বুড়ি। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত রুপোর গয়না দিয়ে মোড়া। ওড়িয়া ভাষায় বিড় বিড় করে কী সব বকে চলেছে। লোকে গদগদ হয়ে শুনছে আর পায়ের কাছে পয়সা ফেলছে।

খালি মাঠে সবসময় ভিড়। ডুগ-ডুগ-ডুগ-ডুগ-ডুগ-ডুগ ঢোলক বাজছে। ম্যাজিক দেখাচ্ছে কেউ। কাঁধ পর্যন্ত বাবরি চুল। কানে লোহার মাকড়ি। অনবরত মন্তর আওড়াচ্ছে আর মাঝে মাঝে চ্যাঁচাচ্ছে— লেড়কালোক একদফে হাততালি লাগাও। বকতে বকতে মুখ দিয়ে ফেনা গড়িয়ে পড়ছে। শুকনো মুখ। দেখলেই মনে হয় সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি। বাজি দেখানো শেষ হতে না হতে ভিড় পাতলা হতে থাকে। পাছে পয়সা দিতে হয় তাই যে যার মতো কেটে পড়ে। মাটিতে ছড়ানো দু-চার আনা পয়সা কুড়িয়ে নিতে নিতে শাপমুন্নি দিতে থাকে ভানুমতীর জাদুকর। ফুস-মন্তরে পয়সাকে টাকা করতে পারে না তবে কীসের বাজিকর? পালাতে পালাতে মনে হয় শাপমুন্নিগুলো বুঝি আমার পেছনেই তাড়া করছে।

পাশে আর একটা ভিড়। দাড়িওয়ালা একজন হেকিম। পরনে তার লাল আলখাল্লা। গলায় হাড়ের মালা। চোখে নিকেলের ফ্রেমের মোটা চশমা। একটা দিক সুতো দিয়ে বাঁধা। সামনে তার একরাশ গাছ-গাছড়া, কাঁচা-ছালচামড়া, হাড়, কাচের কৌটোয় জোঁক আর বিছে, নীল গাইয়ের চামর। বিচ্ছিরি নোংরা। দুর্গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে। কত সব ভারী ভারী রোগের নাম করছে। বাতলে দিচ্ছে কোন রোগের কোন দাওয়াই।

কানের খোল পরিষ্কার করতে বসেছে কেউ। কোথাও ভাঙা কাচ জোড়া লাগাবার আশ্চর্য কাণ্ডকারখানা দেখতে ভেঙে পড়েছে লোক। কোথাও চড়াই পাখি মানুষের ভাগ্য গণনা করছে। বিচিত্র ব্যাপার চলেছে লম্বা রাস্তাটা জুড়ে।

শীতকালে খালি মাঠগুলো জুড়ে তাঁবু পড়ে। সার্কাস আর কার্নিভালের। লাল-নীল আলোয় ঝলমল করে ওঠে গোটা তল্লাট। চাকা-লাগানো মোটা মোটা লোহার গরাদ-আঁটা খাঁচার মধ্যে খিদের সময় গজরাতে থাকে বাঘ আর সিংহ। মানুষের গন্ধে জিভ দিয়ে তাদের লালা গড়ায়। সার্কাসের বাচ্চা বাচ্চা ছেলেগুলো থাকে জেলখানার কয়েদির মতো। রোজ সকালে উঠে কসরতগুলো অভ্যেস করতে হয়। একটু ভুল হলে সপাং সপাং চাবুক। তাই মুখে সবসময় একটা মন-মরা ভাব। টিনের বেড়ার ফুটো দিয়ে তারা বাইরে তাকায় আর মার জন্যে ভাইবোনদের জন্যে মন কেমন করে।

হঠাৎ একটা ভিড়ের ভেতর থেকে কে যেন পকেটে হাত দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—আমার মানিব্যাগ? যেই বলা অমনি ‘ধর ধর’ করে ছুটে গেল জনকয়েক লোক একজনের পেছনে। ছুটোছুটি হই-হল্লা। মাঠ ফাঁকা হয়ে গেল। ভদ্দরলোক যেমন দাঁড়িয়েছিলেন, তেমনি দাঁড়িয়েই থাকলেন। চোরকেও পাওয়া গেল না, চোর যারা ধরতে গেল তাদেরও আর টিকি দেখা গেল না।

তবু ভালো এই সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের রাস্তা। আকাশ এখানে অনেক দরাজ। এ-রাস্তার মানুষগুলোও যেন একটু আলাদা। ঢোলক বাজায়, হাততালি দেয়, হো-হো করে হাসে। উড়ে-মেড়ো-বাঙাল বলে কোনো কথা এ-রাস্তার অভিধানে নেই।

সরু একটা গলির মধ্যে এঁদো ঘরে থাকে ফুচকা, পাকৌড়ি আর আলু-কাবলিওয়ালার দল। কাবলিওয়ালারা থাকে নেবুতলার মোড়ে। কাছ দিয়ে গেলে ভয়-ভয় করে। শুনি নাকি ছেলেধরাদের আস্তানা ওটা। ঝুলি দেখা যায় না, তবে থাকতেও তো পারে।

রাস্তার কলে ভিস্তিওয়ালার ভিড়। ড্রেনের জলে গা ধোয় একদল। হেঁইও হো, হেঁইও হো! সুর টেনে টেনে রাস্তার সুরকির ওপর দুরমুশ চালায় কর্পোরেশনের কুলি।

ঘামের গন্ধে, বনবন শব্দে জমজমাট শহর কলকাতা। চুন-বালি-ইটেরও একটা সৌন্দর্য আছে। সন্ধেবেলা বড়ো রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি ট্রামের তারে চকমকির আগুন জ্বলে। পেতলের পিদিম জ্বালিয়ে ঘোরে মুশকিল আসান।

হঠাৎ একদিন খেপে উঠল কলের কলকাতা। গলিগুলো সব এক টানে বড়ো রাস্তায় এসে পড়ল। শহরময় চাঞ্চল্য। হই-হল্লা। গোলপুকুরে মিটিং। গোলদিঘিতে মিটিং। রাস্তার মোড়ে মোড়ে মিটিং। মিটিং ছাড়া মানুষ নেই। পাড়ার ছেলেরা বাঙাল বলে আর খেপায় না। কাঁধে হাত দিয়ে বলে, চল ভাই মিটিঙে।

পার্কে রোজ মিটিং আর ইস্কুলে পিকেটিং। এ এক নতুন মজা। কেন কেউ জানে না। কিন্তু মেতে উঠেছে সবাই। কেউ আর ছাদে নয়, সব রাস্তায়। জনসমুদ্রে জোয়ার লেগেছে।

একটু একটু করে বোঝা গেল। স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়? ইংরেজ চলে যাক, আমাদের দেশ আমাদের থাক। সত্যিই তো, কেন আমরা পরাধীন থাকব?

সারা শহরে আগুন। সে-আগুনে জ্বলছে বিলিতি কাপড়। পাড়ায় পাড়ায় দল বেরিয়েছে। গমগম করছে তাদের আওয়াজ—বিলিতি কাপড় পুড়িয়ে ফেলো। দুপাশের বাড়ি থেকে রাস্তায় ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে রাশি রাশি বিলিতি কাপড়।

রোয়াকের ওপর বসে বুড়োর দল তকলি ঘোরাচ্ছে। সুতো কাটার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে গল্পগুজব। সারাদিন কোথায় কী ঘটেছে সন্ধেবেলায় তার হিসেবনিকেশ দেন ডাক্তারবাবুর ক্যানভাসার ভাই। আজ অমুক পার্কে লাঠি চালিয়েছে—উঃ কী রক্ত! কাল ময়দানে ঠিক গুলি চালাবে। ভয়ে আঁতকে উঠে যে যার ঘর আগলাবার জন্যে বুড়োর দল তকলি হাতে করে বাড়িমুখো ছোটে।

সারাটা দিন নেশার মতো লাগে। জলখাবারের পয়সা থেকে বাঁচানো চার আনা পয়সা দিয়ে শেয়ালদার মোড় থেকে কিনে আনি খদ্দরের টুপি। সেই টুপি মাথায় দিয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরি। দু-ধারের বাড়িগুলো থেকে লোকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। ছোট্ট ছেলে কিন্তু বুকের পাটা দেখো! পুলিশকে মোটে কেয়ার করে না হে!—বুঝতে পেরে বুক যেন আরও দশ হাত হয়।

বিকেলে বউবাজার স্ট্রিটে কংগ্রেস আপিসের সামনে এসে দাঁড়াই। বাড়িটাতে ঢোকবার মুখে রুটিবিস্কুটের দোকান। তার একপাশে তেলেভাজা ফুলুরি বিক্রি হয়। পাশ দিয়ে গেছে চোরাগলি। দুই ফুটপাথে দুরন্ত ভিড়।

পাশের বাড়ি থেকে হঠাৎ শাঁখ বেজে উঠল। কংগ্রেস আপিসে সাজো-সাজো রব পড়ে গেল। দোতলায় রেলিঙের গায়ে উড়ল প্রকাণ্ড তিনরঙা পতাকা। ততক্ষণে লাল পাগড়িতে ছেয়ে গেছে চোরাগলি। তেল-চকচকে লাঠিগুলো উঁচিয়ে ধরে বীরদর্পে ঢুকে গেল তারা কংগ্রেস আপিসে। সঙ্গে সঙ্গে ‘বন্দেমাতরম’ আওয়াজে কেঁপে উঠল গোটা তল্লাট। গেটের কাছে এসে দাঁড়াল কালো ঢাউস কয়েদি গাড়ি। গোরা সার্জেন্টগুলো বেতের ছড়ি চালিয়ে ভিড় সরাতে লাগল। দোতলায় লাইন বেঁধে দাঁড়াল গান্ধিটুপি মাথায় দেওয়া ভলান্টিয়ারের দল। তাদের মাঝখানে ফুলের মালা গলায় দিয়ে ‘ডিরেক্টর’।

ভিড় ঠেলতে ঠেলতে ভরতি ভ্যান চলল মুচিপাড়া থানায়। পেছনে পেছনে বিরাট জনতা। সেন্ট জেমস পার্কের ছোটো ছোটো ছেলেরা খেলা ফেলে দিয়ে ছুটে আসে। থানার সামনে লোকে লোকারণ্য। রেলিঙের ওপর উঠে বাচ্চা ছেলেরা চ্যাঁচায় ‘বন্দেমাতরম—লাল পাগড়ির মাথা গরম’। জোয়ারের জলের মতো জনতা ফুলে ফুলে ওঠে।

তাদের চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ পুলিশ ভয় পেয়ে যায়। শুরু হয়ে যায় এলোপাথাড়ি লাঠিচার্জ। যে যেদিকে পারে ছুট দেয়। এমনি করে রোজ ছুটতে ছুটতে রাস্তাঘাট চেনা হয়ে গেল।

একদিন কংগ্রেস আপিসের সামনে রোজকার মতো দাঁড়িয়ে আছি। নিয়মিত পাশের বাড়িতে শাঁখ বেজেছে। পুলিশ ঢুকে গেছে কংগ্রেস আপিসে। হঠাৎ দেখি দোতলায় ভলান্টিয়ারদের মধ্যিখানে ফুলের মালা গলায় দিয়ে দাঁড়ানো—আরে এ যে আমাদের রামদুলালবাবু, আমরা যাঁর বাড়িতে থাকি! কী আশ্চর্য, উনি আবার কবে ডিরেক্টর হলেন?

বুকটা দশ হাত ফুলে উঠল। সকলের সঙ্গে গলায় গলা মিলিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলাম—রামদুলালবাবু কী জয়! এমন ভাব নিয়ে চারপাশে তাকাতে লাগলাম যেন ফুলের মালাটা আমার গলাতেই কেউ পরিয়ে দিয়েছে। না বলে পারলাম না—উনি হচ্ছেন আমাদের রামদুলালবাবু, চেনেন না? চারপাশে কেউ কথাটাকে তেমন আমল দিল না বলে একটু চুপসে গেলাম। আমার সঙ্গে চেনা আছে রামদুলালবাবুর, তাই লোকগুলোর অত হিংসে! আরেকজনের কাঁধে ভর দিয়ে মুখটা উঁচু করবার চেষ্টা করলাম, রামদুলালবাবু যাতে আমাকে দেখতে পান। হাসুন না একটু রামদুলালবাবু আমার দিকে তাকিয়ে। লোকগুলো একটু বুঝুক কী রকম লোকের সঙ্গে আমার আলাপ। যার কাঁধে ভর দিয়ে উঠেছিলাম, সে-লোকটা এক ঝটকা দিয়ে আমাকে ফেলে দিল। হাফ প্যান্টের ধুলো ঝেড়ে যখন উঠে দাঁড়ালাম, তখন পুলিশের ভ্যান চলতে শুরু করেছে।

তেলেভাজার দোকানের পাশে সাইক্লোস্টাইলে ছাপা বেআইনি বুলেটিন বিলি হচ্ছিল। এক কপি বুলেটিন কায়দা করে কোমরে গুঁজে বাড়ি ফিরে এলাম। পাড়ায় খবরটা দিতে হবে তো। খবর দিতে গিয়ে বেকুব বনে গেলাম। রামদুলালবাবু জেলে যাচ্ছেন, সে-খবর তো সকলেই জানে। কিন্তু আমাদের গলির এতবড়ো একটা গর্ব, পাড়ায় সেই উৎসাহ কই?

বাড়িতে যখন কেউ না থাকে, আমি আর কাকিমা ঘর অন্ধকার করে উনুনের আঁচে বেআইনি বুলেটিন পড়ি। ইংরেজের সিংহাসন টলোমল টলোমল করছে, স্বাধীনতা দূরে নয়। যত ভাবি তত আনন্দে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমাদের বাড়িওয়ালা জেলে গেছে আমাদেরই জন্যে, সারা দেশের ভালোর জন্যে। আর আমরা ঘরে বসে থাকব?

হঠাৎ একদিন কাকিমা বলে বসলেন, আমাকে নিয়ে চল—আমি জেলে যাব।

সারা কলকাতা খেপে উঠেছে।

রাস্তা দিয়ে হরদম পুলিশের ভ্যান যাচ্ছে। সরু জালের ভেতর দিয়ে একগাদা কালো কালো মাথা দেখা যায়। আর মুহুর্মুহু আওয়াজ ওঠে ‘বন্দেমাতরম’। বড়োবাজারের বিলিতি কাপড়ের দোকানে পিকেটিং, মদের দোকানে পিকেটিং। লোকের মুখে স্বদেশি ছাড়া আর কথা নেই। যেদিন ইস্কুল হয়, সেদিন মাস্টার-ছাত্র একসঙ্গে বসে তকলি কাটি।

খবরের কাগজ বন্ধ। কিন্তু তাতে খবর আটকে নেই। অলিগলির দেয়ালে লটকে দেওয়া হচ্ছে নতুন ধরনের খবরের কাগজ। কালো আর লাল কালিতে হাতে লেখা সংবাদপত্র। কোন রাস্তায় কোন মিছিলের ওপর পুলিশের লাঠি চলেছে, বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামান্তরে কোথায় কতদূর ছড়িয়ে পড়ল আগুন, জেলখানায় কী অমানুষিক অত্যাচার চলেছে—তার টুকরো টুকরো খবর। একদম নীচে লাল কালিতে লেখা—পড়ুন এবং নিজে কপি করে অন্যদের পড়ান। কাগজ-পেনসিল হাতে নিয়ে এক দঙ্গল লোক সেই খবর টুকে নেয়। এমনি করে মুখে মুখে ছড়িয়ে যায় খবর।

রামদুলালবাবুর দাদা একদিন বললেন, দেখা করতে যাবে জেলখানায়?

আনন্দে আটখানা হয়ে সঙ্গে গেলাম। কেমন করে ঘুরে ঘুরে গেলাম মনে নেই। ট্রাম থেকে নামতেই সামনে লোহার প্রকাণ্ড সিং-দরোজা। সেপাইয়ের হাতে চিঠি দেওয়া হলো। হুকুম হলো ভেতরে ঢোকার। ইংরেজের জেলখানায় হেঁট হয়ে ঢুকতে যা রাগ হচ্ছিল। কিন্তু কী আর করা যাবে। আমরা একা নই, অনেকেই তো ঢুকছে।

আমরা ঢুকছি এমন সময় একটা কয়েদ-গাড়ি থেকে নতুন একদল বন্দি এসে হাজির। ‘বন্দেমাতরম’ শব্দে জেলখানা কেঁপে উঠল। একটু এগিয়ে বাঁ হাতের শেষ ঘরটায় বন্দিদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করার ব্যবস্থা। মেঝের ওপর সতরঞ্জি পাতা। ঘরভর্তি লোক। ঘরে একটি মাত্র টেবিল এবং চেয়ার। চেয়ারের ওপর যিনি বসে আছেন, তাঁকে দেখে নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছিল না। কাগজের ছবিতে হুবহু এই মুখ দেখেছি—সুভাষচন্দ্র বসু না? কয়েদ-গাড়ি থেকে একটা করে দল এসে নামছে আর তিনি ছুটে বাইরে যাচ্ছেন। তাদের জড়িয়ে ধরে বলছেন, তোমরা এসেছ?

জাল দেওয়া জানলার কাছে ভেতরের বন্দিরা জেলওয়ার্ডারদের চোখ এড়িয়ে মাঝে মাঝে এসে ভিড় করছিল, কিন্তু সেপাইদের চোখ পড়তেই হুড়মুড় করে তারা সেখান থেকে সরে যাচ্ছিল। একজন ডাক দিল—শোনো খোকা! ‘খোকা’ বলাতে আত্মমর্যাদায় লাগলেও জানলার কাছে গেলাম। ‘বাড়িতে আমার বুড়ি মা আছে, কেঁদে

কেঁদে মরে যাচ্ছে—তুমি খবর দিও আমি ভালো আছি।' বাড়ির নম্বর নিয়েছিলাম কিন্তু কুঁড়েমি করে শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়ে ওঠেনি। আজও তা বিঁধে থাকা কাঁটার মতো মাঝে মাঝে খচখচ করে ওঠে।

জেলের দরোজা পেরিয়ে যেন কেমন কেমন লাগল। রাস্তায় রাস্তায় ফুঁসে-ওঠা মানুষগুলো হাজির হচ্ছে এসে জেলখানার অন্ধকার গুহায়। কী পাবে তারা এখানে?

অমনি মনের মধ্যে গুনগুনিয়ে উঠল মার কাছে শেখা গান: ও তোর শিকল পরা ছল। শিকল পরে শিকলরে তুই করবি রে বিকল।

বুঝলাম না। তবু মনটা একটু তাজা হলো।

তিন মাস অসুখে অচেতন ছিলাম। এর মধ্যে বাসা বদল হয়েছে। উঠে এসেছি ফিরিঙ্গি পাড়ায়। কানাগলি ছেড়ে বউবাজারের বড়ো রাস্তায়। যে রাস্তায় থাকেন ডাকাতে কালী।

কাকিমা দেখলাম একদম বদলে গেছেন। ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনি ঘোরতর সংসারী। কাঁধ থেকে ভাবপ্রবণতার ভূত একেবারে নেমে গেছে। রাস্তায় ক্বচিৎ কদাচিৎ জাল-দেওয়া কয়েদ-গাড়ি চোখে পড়ে।

ভাঁটার টানে জোয়ারের জল নেমে যায়। টলতে টলতে রাস্তায় বার হই। কই কোথায় সেই ফেনিয়ে-ওঠা জনসমুদ্র? পার্কে মিটিং নেই, বড়োবাজারে পিকেটিং নেই। একেবারে নতুন চেহারা শহরের। দেখলে কে বলবে এই শান্ত নিরীহ কলকাতা দু-দিন আগে রেগে খুন হয়ে উঠেছিল।

সব কিছুই বদলে গেছে। মনেই হয় না সামনের বড়ো রাস্তা কোনো দিন বন্দেমাতরম শব্দে মুখর হয়েছিল। ট্রামের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে বাস। ভিড় আছে রাস্তায়—ম্লানমুখ অফিসযাত্রীর অফুরন্ত মিছিল।

চিনেপাড়া থেকে চোলাই-করা বড়ো বড়ো মদের জালা ধরে নিয়ে আসে আবগারি পুলিশ। দু-বগলের নীচে ক্রাচ নিয়ে ঘোরে খোঁড়া ইনফর্মার। গাঁজা-আফিঙের বেআইনি আড্ডাগুলো তার নখদর্পণে। ধরা-পড়া লোকগুলোর জামিন হয় জুতোর দোকানের মালিং চিং-থাই। সারাদিন এইসব দাঁড়িয়ে দেখি।

বিকেলে গিয়ে বসি পারশি চোখের ডাক্তারের চশমার দোকানে। রাস্তায় মোটরের নম্বর গুনি। এত লোক তবু ফাঁকা ফাঁকা লাগে এই শহর।

পাশে দাঁতের হাসপাতালের নীচে ইহুদিদের যেন কী একটা পরব। জানলার ফাঁক দিয়ে গরম গরম হাতে তৈরি রুটি বিলি হচ্ছে দুস্থ ইহুদিদের জন্যে। ঘুড়ির জন্যে মাঝে মাঝে লগি হাতে রাস্তায় ছুটি। বাদাম আখরোটের দোকানের সামনে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকি। হাঁটতে হাঁটতে ফুটপাথের চৌখুপি ঘর গুনি।

গির্জায় রবিবারের ইস্কুল বসে। সকাল বেলায় মাঝে মাঝে গেটের সামনে পেরি সাহেব কেরোসিন কাঠের বাক্সর ওপর দাঁড়িয়ে ভাঙা বাংলায় অ্যাকর্ডিয়ন বাজিয়ে খ্রিস্টসংগীত করেন আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোরা বিলি করে লাল মলাটের চটি বই 'মথিলিখিত সুসমাচার'।

হঠাৎ একদিন বাড়ির সামনে দেখা হয়ে গেল জেলফেরত পুরোনো বাড়িওয়ালা রামদুলালবাবুর সঙ্গে। গোমড়া মুখ দেখে মনে হয় না গলায় কোনোদিন আবেগভরে মালা দেওয়া হয়েছিল। দুঃখ করে বললেন দাদুকে—আর বলেন কেন? মিছিমিছি জেলে যাওয়া হলো। কর্পোরেশনে নতুন নিয়ম হয়েছে জেলে গেলে আর মাইনে বাড়বে না। কী মুশকিল বলুন তো? শুধু শুধু কটা মাস জেল ভোগ করতে হলো।

ও ! এই জন্যে জেলে গিয়েছিলেন ? মাইনে বাড়াবার জন্যে ?

নিজের ওপরই রাগ হলো। কী বোকা আমি ! এই লোকটার জন্যে একদিন গর্ব করে বেড়িয়েছিলাম !

ফুটপাথে ছবি বিক্রি হয়—ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত, যতীন দাসের ছবি।

নেভেনি আগুন। ছাই-চাপা হয়ে সে আগুন জ্বলছে। উল্কার মতো মাঝে মাঝে আকাশ থেকে খসে পড়েছে—মেছুয়াবাজার, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর। খবরের কাগজের প্রথম পাতায় আগুনের হলকার মতো একেকটা খবর। বোমার আওয়াজে কেঁপে ওঠে লালদিঘির দপ্তর। সারা বাংলাদেশকে কাঁদিয়ে ফাঁসি যায় রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, দীনেশ মজুমদার, আরও অসংখ্য শহিদ।

মাঝে মাঝে এক-একটা দমকা হাওয়ায় কলকাতার গুমোট ভাঙে। তার পরই সব চুপচাপ। সন্ধেবেলায় রাস্তায় হেঁকে যায় 'তপসে মাছ', 'বেল ফুলের মালা', 'কুলপি বরফ'। জেল থেকে ফিরে এসে শশাঙ্কর খদ্দরধারী দাদা মিলের ধুতি পরে কলেজে যায়, ঘরের দরজা এঁটে পরীক্ষার জন্যে পড়ে।

বাইরের ঘরে বাবার কাছে আসেন এক সরকারি উকিল। তিনি বলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার গল্প। ঘরে আর কারও থাকার হুকুম নেই। পর্দার পেছনে দাঁড়িয়ে আমি আর দাদা লুকিয়ে লুকিয়ে শুনি। ভদ্রলোক বলেন একেবারে মশগুল হয়ে। যেন তিনি সূর্য সেনেরই দলের লোক। গণেশ ঘোষের লেখা কবিতা সুর করে পড়েন। কল্পনা দত্তের ডাইরি থেকে পাতার পর পাতা মুখস্থ বলে যান। মুগ্ধ বিস্ময়ে আমরা বসে শুনি। অসাধারণ বলার ক্ষমতা ভদ্রলোকের।

কাহিনি যে কখন শেষ হয়ে যায় খেয়ালই থাকে না। মাঝে মাঝে পর্দার পেছনে ধরা পড়ে গিয়ে বকুনিও খাই।

পাহাড়তলী, ধলঘাট, কালারপোল—যেন কুরুক্ষেত্রের একএকটা উপাখ্যান। সূর্য সেন আর অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিং আর গণেশ ঘোষ, কল্পনা দত্ত আর প্রীতি ওয়াদ্দেদার যেন কুরুক্ষেত্রের এক একজন মহারথী। নেই তাদের অক্ষৌহিণী সেনা। তারা বোঝাতে চেয়েছিল অসির বিরুদ্ধে চাই অসির ঝঞ্ঝনা।

সরকারি উকিল চলে যাবার পর রাগে হাত নিসপিস করে। লোকটা একজন পয়লা নম্বরের ভণ্ড। মুখে এক, মনে এক। গল্প বলবার সময় দেশকে ভালোবাসার কত কথাই না সে বলে। সূর্য সেনদের জন্যে দরদ যেন তার উথলে উঠছে। কিন্তু এর পরই বাড়ি ফিরে গিয়ে লোকটা বাংলার বীরদের ফাঁসিকাঠে ঝোলাবার জন্যে আইনের পাতা ঘাঁটতে বসবে। এরা মানুষ না আর কিছু ?

আমি আর দাদা দেয়ালের ছবির কাছে প্রার্থনা জানাই—ঠাকুর, সূর্য সেনকে ওরা যেন খুঁজে না পায়।

রাস্তায় গণৎকারের কাছে হাত দেখাতে বসি— দেশ স্বাধীন হবে কবে ? গণৎকার গম্ভীর হয়ে আঁকজোক করে বলে—আড়াই বছর পরে।

তারপর কত আড়াই বছর কেটে গেল। গণৎকারদেরও কত ভোলই না বদলাল। তারা কখনও বেকারদের হাত দেখে বলল চাকরি হবে কিনা, কখনও ভয়ে-পালানো লোকদের বলল জাপানি বোমায় প্রাণ যাবে কিনা। কলকাতার মরা গাঙে বার কয়েক ছোটো বড়ো ঢেউ এসে লাগল বটে, কিন্তু বান ডাকল না আর।

কাকার জুট আপিসের চাকরি গেল। সরকারি আপিসে বাবার মাইনে কাটা গেল। ছা-পোষা সব সংসারেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল অভাবের আগুন। সস্তা ভাড়ায় দেড়খানা ঘরে কোনোরকমে মাথা গুঁজে কোণঠাসা হয়ে উঠে যেতে হলো শহরতলীতে।

এই ক-বছরে আপন করে নিয়েছে এই শহর। আকাশের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ নেই অনেকদিন। বিকেলবেলায় ট্রাম-রাস্তায় এসে মাঝে মাঝে চকিতে দেখা হয়ে যায়—তাও পুরো আকাশ নয়, কুমড়োর ফালির মতো এক একটা টুকরো। বিকেলবেলায় পথ-চলতি লোকের ভিড়ে মিশে যাই। মজা লাগে লোকের মুখের দিকে তাকাতে। তাদের ভাবনা ফুটে ওঠে মুখের বিচিত্র রেখায়। কারো মুখে বিরক্তির ভাব। কারও মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া। কারো চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। উলটো করে জামা পরেছে কেউ। একা চলতে চলতে কারো হয়তো মনে পড়ে গেছে খুব হাসির একটা কথা। আপন মনে হেসে উঠে হঠাৎ লজ্জা পেয়ে চারিদিকে তাকিয়ে নেয়—কেউ দেখে ফেলেনি তো? একই রাস্তায় পাশাপাশি চলে এমনি নানা জাতের রকমারি মানুষ।

চেহারা বদলে যাচ্ছে শহরের। অজগরের পেটের মতো ফুলে ফেঁপে ওঠে কলের কলকাতা। জমিজায়গা হারিয়ে শহরে আছড়ে পড়ে গাঁয়ের মানুষ—কাজের জন্যে, দু-মুঠো ভাতের জন্যে। বেহুলার ভাসানে যে ছেলেটা লখিন্দর সাজত, সে এখন চিনির কলে কাজ নিয়েছে।

কালাপানি পেরিয়ে হঠাৎ খবর এল আন্দামানের বন্দিরা অনশনে। চোখের আড়াল হবার পর যারা ভুলে গিয়েছিল এতদিন, তাদের বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল। ইস্কুল-কলেজ ছেড়ে ছেলেমেয়ের দল বার হয়ে এল রাস্তায়। তাজা রক্তে হাত রাঙাল লালমুখো সার্জেন্ট আর লাঠিয়াল পুলিশ। তবু ফুঁসে ওঠা জনতার সেই ঢেউ বন্দিদের ছিনিয়ে নিয়ে এল স্বদেশের মাটিতে।

ঢেউ আবার মিলিয়ে যায়। থমথম করে কলকাতার রাস্তা। মাঝে মাঝে মিটিং হয় পার্কে। চায়ের দোকানে তর্ক চলে। রাস্তায় ঝিলিক দিয়ে যায় একটা নতুন নিশান—লাল শালুর তৈরি। তার মাঝখানে কাস্তে আর হাতুড়ির হাতে-হাত-দেওয়া ছবি। যারা সেই নিশান বয়ে নিয়ে যায়, তারা কারখানার মজুর। হেঁকে বলে তারা—ইনকিলাব জিন্দাবাদ। হাত মুঠো করা তাদের আওয়াজ যেন বজ্রের কানেও তালা ধরায়। মুখে মুখে রটে যায় একটা নাম—কমরেড লেনিন। একটা তারিখ—পয়লা মে।

যুদ্ধ বাধবে বাধবে করে একদিন বেধে যায়। ঘরের কাছে এগিয়ে আসে তার হুংকার। অন্ধকারে দেয়ালে দেয়ালে কারা এঁটে দেয় গোটা হরফের নিষিদ্ধ ইস্তাহার।

অন্ধ রাগে ফেটে পড়ে কলকাতার রাস্তা। বিয়াল্লিশ সালের আগস্টের কলকাতা। ট্রাম পুড়ছে। এবার লাঠি নয় গুলি চলছে রাস্তায়। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের ভয়ডর নেই। ইট হাতে নিয়ে বন্দুকের সামনে দাঁড়াচ্ছে। বলছে ইংরেজ, ভারত ছাড়ো।

দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য সেই আগুন জ্বলতে জ্বলতে একদিন ছাই হয়ে নিভে গেল।

কলকাতার ফুটপাথে সেদিন মরা মানুষের ভিড়ে পা পাতা যায় না। গ্রামগুলো সব পেটের জ্বালায় উঠে এসেছে শহরে। মড়া ডিঙিয়ে রাস্তা হাঁটতে হয়। বাতাসে দুর্গন্ধ। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। পচন ধরেছে কলকাতার শরীরে।

চাষির গোলার ধান জমিদার-জোতদারদের মুঠোয়। জেলেদের নৌকো সরকারের হাতে আটক। গাঁয়ে চাল নেই। অভাবী মানুষগুলো তাই অন্নের সন্ধানে ছুটেছিল শহরের দিকে।

গাঁয়ের বীজ বোনা মাঠে যখন ধানের শীষ আবার পেকে উঠল, তখন শোকে-তাপে-পোড়া মানুষগুলো আবার ফিরে গেল গাঁয়ে। মায়েরা গেল কোল খালি করে, মেয়েরা গেল হাতের লোহা ঘুচিয়ে।

যেমন ছিল তেমনি থাকল কলের কলকাতা। চালের দোকানে কিউ, কাপড়ের দোকানে কিউ। আলো-নেভানো রাত্তির। দিনের বেলায় জাপানিরা বোমা ফেলে গেল ডালহাউসি আর খিদিরপুরে। মাছির মতো ঝাঁকে ঝাঁকে মরল ডকের মজুর।

তবুও কোনো সাড়া নেই কলকাতার। মাঝে মাঝে দু-চার বার চোখ খুলে তাকালেও মুখ বুঁজে ঝিম মেরে পড়ে থাকল কলের কলকাতা।

রাস্তায় রাস্তায় আলোর চোখ থেকে খসে পড়ল ঠুলি। লড়াই শেষ। বুঁজিয়ে দেওয়া হল গড়খাই। মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হলো ব্যাফলওয়াল। লালকেল্লায় বন্দি হল আজাদ হিন্দ ফৌজ।

হঠাৎ শহরের কী হলো কে জানে?

ক্লাইভ স্ট্রিটে দাঁড়িয়ে আছি। ছাত্রদের এক বিরাট মিছিল। সেই মিছিলে হাত ধরাধরি করে উড়ছে তিন-তিনটে নিশান—কংগ্রেস, লিগ আর ছাত্র-নওজোয়ানের। রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছে মাথায় হেলমেট লাগানো টমিগান আর রাইফেলধারী পুলিশ।

দু-পাশে বড়ো বড়ো আকাশ-ছোঁয়া ইমারত। ডাকাত ক্লাইভের বংশধর শ্বেতাঙ্গ বোম্বেটেদের বড়ো বড়ো সাইনবোর্ড ঝুলছে বাড়িগুলোর গায়ে। চটকল আর ব্যাংক, খনি আর বাগান, জাহাজ আর রেলের সওদাগরি অফিস। ওপরতলার জানলা দিয়ে ক্রুদ্ধ চোখে কালা আদমিদের উদ্ধত মিছিলের দিকে তাকিয়ে আছে ধনকুবের বড়ো বড়ো সাহেব। তাদের আশেপাশে হাজির দু-চারটে কালো মুখ— কোটিপতি মাড়োয়ারি আর গুজরাটি বেনে।

হঠাৎ সামনের সশস্ত্র পুলিশ বেটন হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল মিছিলের ওপর। গর্জে উঠল কাঁদুনে বোমা। রাস্তার ওপর পুথিপত্রের ছেঁড়া পাতাগুলো ছড়িয়ে রক্তাক্ত দেহগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে পিছু হটে গেল বাচ্চা ছেলেদের মিছিলে। যাবার সময় শুধু চেঁচিয়ে জানান দিয়ে গেল—আবার ফিরে আসব।

সন্ধের আগে সারা শহরে রটে গেল সেই খবর। রাগে রী রী করে উঠল তামাম শহর কলকাতা।

অলিগলি থেকে, বস্তি-মাটকোঠা থেকে পিল পিল করে বেরিয়ে এল মানুষ। আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলছে চোখ। যে যা পেয়েছে, তাই নিয়ে দাঁড়িয়েছে রাস্তায়। সে-রাত্তিরে গুলি চলল মেছোবাজারের মোড়ে।

তারপর বেপরোয়া কয়েকটা দিন, রাগে দিশেহারা কয়েকটা রাত্তির।

ডাস্টবিনগুলো এনে দাঁড় করানো হলো রাস্তার মাঝখানে। তৈরি হলো নিরস্ত্র জনসাধারণের ব্যারিকেড। সারা শহর ধোঁয়ায় ধোঁয়া। ইংরেজের যেখানে যা চিহ্ন, যেখানে যা প্রতীক—তা মুছে দেবার জন্যে পাগল হয়ে উঠল শিকল-পরা মানুষ।

ভয়ে গর্তে ঢুকে গেছে লালপাগড়ি পুলিশ। মিলিটারির হাতে দেওয়া হয়েছে কলকাতাকে সামাল দেবার ভার। লাঠিকে হটিয়ে দিয়ে বন্দুক হয়েছে রাজা।

ওয়েলিংটনের মোড়ে, হাজরার মোড়ে টমিগান, ব্রেনগান বাগিয়ে ওত পেতে বসে আছে গোরা পল্টন।

মিলিটারি লরির একা যাবার উপায় নেই। তাই রাইফেল উঁচিয়ে চলে দলবাঁধা কনভয়। তবু রেহাই নেই। পুঁচকে ছেলেরা হামাগুড়ি দিয়ে ছুটে গিয়ে ঠিক আগুন লাগিয়ে দেয়। শিখে নিয়েছে তারা সমস্ত প্যাঁচ। গুলি ছুঁড়লে থামের পাশে আড়াল নেয়। গুলি লাগলে 'জয় হিন্দ' বলে উলটে পড়ে মাটিতে।

সে এক দুরন্ত লড়াই। বন্দুকের মুখোমুখি হয় দুঃসাহসী ইট আর শুধু-হাত। লড়াই চলে পাঁচমাথা আর মানিকতলায়, লড়াই চলে পোড়াবাজার আর রসা-রাসবিহারীর মোড়ে।

সার-সার মিলিটারি লরি পুড়ছে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের বিরাট চওড়া রাস্তায়; পুড়ছে সাহেবদের চা কোম্পানির গাড়ি। ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে আছে গোটা তল্লাট। মাঝে মাঝে সাঁজোয়া গাড়িতে সর্বাঙ্গ ঢেকে হুস হুস শব্দে ছুটে

যাচ্ছে রাইফেলধারী গোরা পল্টন। গুলি চলছে বেপরোয়া। তবু রাস্তায় ভিড় কমে না। যেখান থেকে যে পেরেছে খসিয়ে নিয়েছে বড়ো বড়ো লোহার ডান্ডা। মাটিতে ঘেঁসটানি লেগে তাতে হিস হিস শব্দ উঠছে।

ময়লা-কাপড়-পরা অগণিত মানুষ দাঁড়িয়ে। তারাই আজ রাস্তার রাজা। তাদের বিনা অনুমতিতে কোনো গাড়ির যাবার হুকুম নেই। যে-কোনো গাড়ি দাঁড় করাচ্ছে। জরুরি কাজ আছে বোঝাতে না পারলে ফিরিয়ে দিচ্ছে।

ছেলের হাত ধরে বাপ দাঁড়িয়ে আছে। গুলি চলুক পরোয়া নেই। ছেলের হাতের মোয়া নয় স্বাধীনতা। শয়তানের হাত মুচড়ে ছিনিয়ে নিতে হবে দেশের স্বাধীনতা, ফুটপাথে ভিড় জমিয়ে খেলা দেখাত যে লোকটা, চৌরঙ্গির রেস্তোরাঁয় বয়ের কাজ করত যে ছেলেটা, শেয়ালদার বাজারে যে লোকটা ঝাঁকামুটের কাজ করত, যে ছেলেটা হোয়াইটওয়েরে তলায় বসে জুতো বুরুশ করত আর বলত এমন পালিশ হবে বাবু জুতোয় মুখ দেখতে পাবেন—তারা সবাই এসে দাঁড়িয়েছে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের রাস্তায়।

কার্জন পার্কে তিলধারণের জায়গা নেই। গুর্খা আর গোরা পল্টন যত পা পেছোয়, ক্ষুব্ধ জনসমুদ্র তত পা এগোয়। ট্রামের গুমটির কাছাকাছি আসতে পারলেই বিলিতি হোটেল আর দোকানগুলোর মোটা কাচ ইট লেগে ঝন ঝন করে ভেঙে পড়ে।

ধর্মতলার চৌমাথা থেকে দূরে দেখা গেল একটা মিছিল। লাল, সবুজ আর তিনরঙা নিশান গিঁঠ দিয়ে বাঁধা। এগিয়ে এল মিছিল। যাবে দক্ষিণে। হঠাৎ তিনটে ছুটন্ত মিলিটারি ট্রাক রাস্তার পাশে থেমে গেল। লাফ দিয়ে নেমে পড়ল তিন গাড়ি পল্টন। রুখে দাঁড়িয়ে বুক টিপ করে তারা রাইফেল উঁচিয়ে ধরল। খবরদার! আর এক পা এগিয়েছো কি...

রুদ্ধ নিশ্বাসে দাঁড়িয়ে আছি। কী করবে মিছিলের আগের লোকগুলো? এগিয়ে যাবে? গুলির মুখে প্রাণ দেবে? 'জয়হিন্দ' আওয়াজ তুলে বুক টান করে লোকগুলো পা বাড়াল সামনের দিকে। কী হলো? বীরপুঙ্গব পল্টনেরা যে সভয়ে সরে দাঁড়াল দুপাশে! গুলি করার হুকুম ছিল, কিন্তু সামনাসামনি দাঁড়িয়ে সাহসে কুলোয়নি তাদের।

মাঝে মাঝে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চলছে কার্জন পার্কের দিকে।

তারই মধ্যে একটি বাচ্চা ছেলে দেখি একটা লাঠির আগায় ছেঁড়া ন্যাকড়া জড়িয়ে মশাল জ্বালিয়েছে। মশালটা নিয়ে আস্তে আস্তে সে রাস্তা পার হলো। সামনে মিলিটারি ট্রাক দাঁড়ানো। তবু ভ্রূক্ষেপ নেই। কাছেই সাহেবদের একটা হোটেল। একতলার দরজা-জানলা আঁটা। ছেলেটা হাতে মশাল নিয়ে থাম বেয়ে ওপরে উঠল। তারপর জ্বলন্ত মশালটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ভেতরে। দাউ দাউ করে আগুন জলে উঠল। সাহেবদের ভয়ার্ত চিৎকার। তারপর ছেলেটা থাম বেয়ে আস্তে আস্তে নীচে নেমে এল। মিলিটারি লরিটার দিকে ক্রুদ্ধ চোখে একবার তাকিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে যখন সে চৌমাথায় এসে পৌঁছাল, তখন লুঙ্গিপরা এক ফলওয়ালা ঝুড়ি হাতে ছুটতে ছুটতে এসে তার হাতে একটা কমলালেবু গুঁজে দিয়ে গেল। কমলালেবুটা ছাড়াচ্ছে এমন সময় পেছন দিক থেকে গুলির একটা শব্দ। ছেলেটা মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল।

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মিনিটে একজন করে বুলেট-বেঁধা লোক আসছে। কাউকে কাউকে হাসপাতালে না নামিয়ে সোজা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মর্গে। যাদের আত্মীয়স্বজন আছে, তাদের ঘিরে আকাশবাতাস জুড়ে বুকফাটা চিৎকার উঠছে।

একজন ধুতিপাঞ্জাবি পরা লোক ঢুকতে চাইছিল ইমার্জেন্সির ভেতর। ভলান্টিয়াররা কিছুতেই ঢুকতে দেবে না।

—দেখুন মশাই, ভিড় বাড়াবেন না।

লোকটাও নাছোড়বান্দা।—আমার দরকার আছে।

ভলান্টিয়ার ছেলেটি এবার চটে গেল। কী দরকার শুনি?

লোকটা খুব শান্তভাবে বলল, গুলি লেগেছে আমার।

গুলি লেগেছে? দেখি?

লোকটা পেছন ফিরল। পিঠের দিকে জামা আর কাপড় রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কড়ে আঙুল সমান ছ্যাঁদা হয়ে গেছে পিঠটা।

বলেননি কেন এতক্ষণ? হেঁটে এসেছেন কেন?

—বলে হন্তদন্ত হয়ে ভলান্টিয়ার ছেলেটি খাটের ওপর লোকটিকে শুইয়ে ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে গেল।

গুলি খেয়ে লোকটি ভয় পায়নি। তার লজ্জা গুলিটা বুকে না লেগে পিঠে এসে লেগেছে বলে। পিঠে গুলি দেখে লোকে না ভেবে বসে সে ভয়ে পালাচ্ছিল।

রাজাবাজার বস্তিতে শহিদ হলো কদম রসুল।

পরদিন সন্ধেবেলা বস্তির সবাই দড়ির ভাঙা খাটিয়াগুলো রাস্তায় টেনে মিটিং করল। সবাই দু-চার পয়সা করে চাঁদা দেবে। বাঁচিয়ে রাখবে তারা রসুলের অসহায় কাচ্চাবাচ্চাদের। পয়সা দেবে যারা সারাদিন রিক্সা টানে, বিড়ি বাঁধে, ফেরি করে জিনিস বেচে, কলকাখারনায় কাজ করে। মরদ ছিল কদম রসুল। গ্যাস কোম্পানির ইউনিয়নের একজন পান্ডা ছিল সে। মালিকের চোখ-রাঙানিকে কখনও ভয় করেনি। দিল ছিল তার। বস্তির সবাই তাকে ভালোবাসে।

কদম রসুলের বাচ্চা ফুটফুটে মেয়েটা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে সকলের মুখের দিকে। কোথায় গেছে তার আব্বাজান?

শুধু মানুষ খুন নয়, জানোয়ারগুলো লুটের রাজত্ব চালায়। পানের দোকান থেকে ছিনিয়ে নেয় টাকাপয়সা, মনিহারি দোকান থেকে দামি জিনিস, বস্তি থেকে হাঁস-মুরগি।

রাত্তিরে জ্বলন্ত আগুনের আলোয় তারা রাইফেল আর টমিগানের মুখে শিকার করে বেড়ায় নিরস্ত্র মানুষ—গুলি লেগে দোতলার বারান্দায় লুটিয়ে পড়ে ছ-বছরের কচি মেয়ে।

যখন উঠে দাঁড়াল সারা শহর, বসে থাকলেন পাকা-চুল নেতারা। শুধু বসে থাকলেন না, গুন্ডা দুর্নাম দিয়ে বসিয়ে দিলেন তাঁরা গোটা শহরের মানুষকে।

আস্তে আস্তে আলগা হয়ে গেল মুঠো। ট্রামগাড়ি আবার চলতে লাগল। যেখানকার সেখানে ফিরে গেল ডাস্টবিন। পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে লালদিঘির দিকে অফিসযাত্রীর দল আবার পা বাড়াল।

কিন্তু ইংরেজের টনক নড়ে গিয়েছিল। সেপাই সান্ত্রীও আর তার বাধ্য নয়। এবার মানে মানে সরে পড়াই ভালো। নইলে কপালে অনেক দুঃখ।

ইংরেজ গেল। কিন্তু যেতে যেতে রাস্তায় বেশ কিছু কাঁটা ছড়িয়ে দিয়ে গেল।

তারপর বছর না যেতে দেশ ভাগ। ভাইয়ে ভাইয়ে খুনোখুনি চলল কলকাতার রাস্তা জুড়ে। মৃত্যুকে এত বীভৎস হতে কেউ কখনও দ্যাখেনি। ভরে গেল রাস্তা চালচুলোহীন উদ্‌বাস্তু মানুষের ভিড়ে।

ইতিহাস নয়। এইখানে শেষ হলো কলকাতার গল্প।

দিন যায়, বছর যায়। কেউ বলে শেষ করতে পারে না কলকাতার গল্প। ট্রামের তারে, বাসের চাকায় নিজেই গল্প বলে যায় কলের কলকাতা। রাস্তায় রাস্তায় আগুনের অক্ষরে ইতিহাস লেখে, আবার নিজেই মুছে দেয়।

কলকাতার ইটের পাঁজরে লুকিয়ে আছে ভালোবাসার ঝরনা। সে ঝরনা কখনও শুকোয় না। যতদিন মানুষ আছে এই শহরে, ততদিন অফুরন্ত এই ভালোবাসার ঝরনা।

মাঝে মাঝে প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ে সেই ভালোবাসা। জীর্ণ দালানগুলোর ভিত নড়ে ওঠে; আকাশে বাতাসে ওঠে বজ্রের নিনাদ। যতদিন হাতের সব শিকল ভেঙে না পড়ছে, রাগ শান্ত হবে না কলকাতার।

শিয়ালদহ আর বউবাজারের মোড়ে রাস্তার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে নাক-বরাবর পশ্চিমে তাকিয়ে কী দেখতে পাও? ধোঁয়াটে দালান ছাড়া আর কিচ্ছু না। কিন্তু ক-বছর আগেও ঠিক ওইখানে দাঁড়ালে সোজা দেখতে পেতে হলওয়েল মনুমেন্ট। পাথরের খোদাই করা ইংরেজদের মিথ্যে ইতিহাস। কলকাতার মানুষ সেই জাল ইতিহাসকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে আন্দোলনের জোয়ারে।

কিন্তু আজও ময়দানের পাথরের বহু স্তম্ভে, মনুমেন্টের গায়ে ভারতবাসীর মুখে চুনকালি-দেওয়া সাম্রাজ্যবাদের দম্ভ বজায় আছে। ক্লাইভ স্ট্রিটের নাম বদলালেও ক্লাইভের বংশধরেরা আজও চক্‌মিলানো বড়ো বড়ো দালানে বহালতবিয়তে বেঁচে আছে। চা-বাগান, চটকল, কয়লার খনি থেকে শুষে খাচ্ছে তারা কালা আদমির রক্ত। আর দেশি দালালরা তাদের এঁটো পাতা চাটছে।

কাগজ পড়ি আর রাত্তিরে মাঝে মাঝে উড়োজাহাজের শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। যদি যুদ্ধ হয়? বোমার আঘাতে গুঁড়িয়ে যাবে পড়ো পড়ো দেয়ালের শহর কলকাতা। ধুলোর মধ্যে ধুলো হয়ে যাবে এ শহরের তামাম মানুষ।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আবার স্বপ্ন দেখি: আলোয় আলো হয়ে আছে সারা কলকাতা। শান্তির পতাকা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় চলেছে মানুষের বিচিত্র মিছিল। মাথার ওপর উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা পায়রা। যত তারা এগোচ্ছে দুপাশে মাথা তুলছে নতুন নতুন দালান। চেহারা বদলে গেছে শহরের। চেহারা বদলে গেছে মানুষের। চোখেমুখে উপচে পড়ছে তাদের স্বাস্থ্য। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা হাতে ফুল নিয়ে হাসছে।

ঘুম ভেঙে কলকাতাকে বলি: স্বপ্নের সেই সুন্দর দিন চলো এগিয়ে আনি।

জগদ্দল পাথর

কলকাতা থেকে নাকবরাবর রাস্তা গেছে সোজা উত্তরে। ব্যারাকপুর রোডের দুপাশে যদি তাকাও দেখবে লম্বা পাঁচিলে গণ্ডি দেওয়া উঠোনের মধ্যে দৈত্যের মতো ইমারত। কালিঝুলি মাখা কিম্ভুতকিমাকার চেহারা। করোগেট টিনের ছাপ্পর ফুটো করে আকাশের মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে অসংখ্য সরু সরু চিমনি।

সামনে লোহার প্রকাণ্ড ফটক। তাতে একটা মাত্র মানুষ গলে যাবার মতো ছোট্ট এতটুকু ফুটো। বাইরে তাজা কার্তুজের বেল্ট পৈতের মতো গলায় ঝুলিয়ে টুলের ওপর বসে বসে ঝিমোচ্ছে বন্দুকধারী পাহারা। ফটকের সামনে ধুলোর মধ্যে পা ছড়িয়ে বসে আছে তেলেভাজা-মিঠাই আর চানাচুর-গরম। চারপাশে এঁটো শালপাতার জঙ্গল।

কারখানার গা ঘেঁষে এবড়ো-খেবড়ো হাড়-বার-করা গলি। দুপাশে তার কুলিলাইন। মোড়ের ওপর ছাইপাঁশের উঁচু ঢিবি।

ব্যারাকপুর রোড কোথাও কোথাও কাটা পড়েছে রেলের লাইনে। মালগাড়ি যাবার রেল পাতা রাস্তায়। চটের বস্তা পাড়ি দেবে সাত সমুদ্র তেরো নদী। সাত রাজার ধন মানিক আসবে দেশে—ক্লাইভ স্ট্রিটের বিদেশি সওদাগর আর তাদের দেশি মুৎসুদ্দিদের পকেটে। একগলা জলে দাঁড়িয়ে যারা বুনেছে পাট আর সেই পাটের আঁশ দিয়ে বুনেছে যারা চট, তারা সবাই থাকবে না খেয়ে।

জগদ্দলে পৌঁছোতে বেলা গড়িয়ে গেল। রাস্তায় জ্বলে উঠল আলো। কানে তালা ধরিয়ে কারখানায় কারখানায় বেজে উঠল ভোঁ। হঠাৎ রাস্তা লোকে লোকারণ্য। হাঁ হয়ে খুলে গেল কারখানার প্রকাণ্ড গেট। গলগলিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত নিংড়ানো অসংখ্য মানুষ। পায়ে পায়ে উড়ছে কুয়াশার মতো দম আটকানো ধুলো। কাঁধে কাঁধ দিয়ে চলেছে বাঙালি-বিহারি-মাদ্রাজি-ওড়িয়া নানা জাতের মানুষ। চুলের সঙ্গে আটকে আছে চটের ফেঁসো। দূর থেকে ঠিক পাকা চুলের মতো দেখায়।

ইউনিয়ন অফিসে সত্য দাশের সঙ্গে দেখা। জগদ্দলের ছেলেবুড়ো সকলেরই 'মাস্টারমশাই'। এ অঞ্চলে মাস্টারমশাইকে চেনে না এমন লোক নেই। পরনে ময়লা একটা পাজামা। পায়ে গোড়ালিবিহীন ছেঁড়া কাবলি জুতো। গোঁফদাড়ির অভাবে খুবই ছেলেমানুষ দেখায়। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে হয়েও মাস্টারমশাই চটকলের মজদুরদের মধ্যে বেমালুম মিশে গেছেন।

মাস্টারমশাইকে নিয়ে জগদ্দলের রাস্তায় বার হওয়াই মুশকিল। দুপাশ থেকে টানাটানি করে অসংখ্য লোক। সকলেরই দরকার মাস্টার মশাইকে। কারখানার সাহেব বড়ো বাড়াবাড়ি শুরু করেছে, একটা কিছু না করলেই নয়। ছাঁটাই চলছে অমুক কলে। ধর্মঘট না করলে চলছে না আর। ছুটির দরখাস্ত লিখে দিতে হবে একটা। এমনি হাজার দরকারে মাস্টার মশাইকে চাই। চা তাঁকে খেতেই হবে। নইলে রাগ করবে ঢেনকানলের রঘুয়া।

সরু একটা গলির মধ্যে দোকান। টিন দিয়ে ছাওয়া বাঁশের চাঁচের ঘর। বাইরের বারান্দা থেকে ঘরের মেঝে বেশ একটু নীচু। সারি সারি বেঞ্চি পাতা। ঘরে একটামাত্র দরজা। জানলার বালাই নেই। ঘরটা বেজায় স্যাঁতসেঁতে। মিলফেরত কুলির দল বেঞ্চিতে সজোরে ঠ্যাং তুলে সর্দার আর বাবুদের ওপর গায়ের ঝাল মেটাচ্ছে।

অ্যালায়েন্স মিলের বিমার সুখদেওয়ের সঙ্গে আলাপ হলো চায়ের দোকানে। রোগা কালো হাড়-বার-করা চেহারা। চোখ দুটো অসম্ভব চকচকে। সপ্তাহে সপ্তাহে যে মজুরি পাওয়া যায়, তাকে বলে হপ্তা। সুখদেও হপ্তা পায় আট-ন টাকা। মা-বাপ ছেলে-বউ নিয়ে আট জনের সংসার তাতে কিছুতেই চলতে চায় না। আধপেটা খেয়ে পাঁচদিনের চালে সাতদিন চালাতে হয়। তাও প্রতি চার সেরে আধ সের করে ইটের কুচো। খেয়ে খেয়ে পেটের ভেতরটা কংক্রিটে ঠাসা হয়ে গেছে।

ফতুয়ার পকেট থেকে পোস্টকার্ডে ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে লেখা একটা ভাঁজ করা চিঠি বার করে সুখদেও। দেশ তার উড়িষ্যায়। শ্রাবণ-আশ্বিনে ব্রাহ্মণী নদীর উপরো-উপরি দু-দুবার বানে ডুবে গেছে ধান আর রবিখন্দ। তাই বারবার করে যেতে লিখেছে। কিন্তু যাবে কেমন করে? দেনায় মাথার চুল পর্যন্ত বিকোনো। ঘরে যেতে গিয়ে ভিটেটাও শেষে লাটে ওঠাবে?

ভোর হতেই লাইনে লাইনে কাবলিওয়ালারা ঘোরে। কাবলি জুতোর মশমশ আর লাঠির ঠক ঠক শব্দে সবাই চমকে চমকে ওঠে। শুক্র, শনি, রবি—আঁতপুরের নিমতলায় কিংবা কারখানার গেটে কুলিদের তারা পাকড়াও করে। বেশি কথার লোক নয় তারা। বুলি তাদের একটাই: 'আসলি নেহি মাংতা, সুদ লাও।' আসল চাই না, সুদ চাই। মাসে টাকার দু-আনা সুদ। দশ টাকা নিলে চার সপ্তাহে চার কিস্তিতে শোধ দিতে হবে আসলের দেড়া।

চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে ডান হাতে ন-নম্বর গলি। চাঁচের দেয়াল কাত হয়ে হেলে পড়েছে। ঘর এফোঁড়-ওফোঁড় করে ভেতর অব্দি ঢুকে গেছে রাস্তার নর্দমা। দরোজা বলে কিছু নেই। কুকুর আটকানোর জন্যে ছেঁড়া চটের শুধু পর্দা ঝুলছে। রাস্তা থেকে ঘরের মেঝে দু-তিন ফুট নীচু। চারদিকে ভনভন করছে মাছি।

একটু এগোলে নজরে পড়ে কোন এক সর্দারের হাল-ফ্যাশনের পাকা বাড়ি। ঘরে তার দু-তিনটে গোরুও আছে। নিজের দুটো মাটকোঠাও আছে, ভাড়া খাটায়।

সর্দারের হপ্তা পঁয়তিরিশ টাকা। হপ্তা যাই হোক, মাসে তার উপরি মেলে পাঁচ-ছশো টাকার এক আধলা কম নয়। গঙ্গার ওপারে মিলের বাবুদের এই বাজারেও নতুন নতুন কোঠা উঠছে; দোতলা বাড়ি তিনতলা হচ্ছে।

মেঘনা মিলের বেনারসির সঙ্গে আলাপ হলো রাস্তায়। সর্দারকে বাইশ টাকা ঘুষ দিয়ে বেচারা কাজে ঢুকেছিল। জ্বর গায়ে দু-দিন কামাই হবার পর জবাব হয়েছে।

কাজ যাবার ভয়ে অনিল জ্বর নিয়ে আর রামধনী মাজার ব্যথা নিয়েই কলে যায়। ঘুষ দিতে না পারলে ছুটি নেই। লেট হলে সঙ্গে সঙ্গে জবাব।

একটু এগিয়ে অ্যালায়েন্স সাউথ লাইন ওরফে নয়া বাড়ি।

সুলেমান মিঞার ঘরে গিয়ে উঠি। ছাঁচে-ঢালা পাঁচ-হাত লম্বা, দু-হাত চওড়া পায়রার ক্ষুদে ক্ষুদে খোপ। আট টাকা ভাড়া। একজনের পক্ষে এত ভাড়া মাসে মাসে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই একটা ঘরে ন-দশজন ঠাসাঠাসি করে থাকে। থাকা মানে কোনো রকমে চোখের দুটো পাতা এক করার মতো একটু জায়গা বেছে নেওয়া।

সুলেমান মিঞার ঘরের মধ্যে তাকিয়ে মনে হলো এর চেয়ে ভালো খোলা আকাশের নীচে বেদের টোল। খানকয়েক ছেঁড়া উলিডুলি চট ছাড়া আর কিছুই নেই। ঘরে একটি মাত্র জানলা। বন্ধ থেকে সেটা কুলঙ্গির কাজ করে। সেখান থেকে খানকয়েক রং চটা কলাই করা সানকি আর টিনের কৌটো। বাইরের দাওয়ার ওপর গনগন করে জ্বলছে কাঁচা কয়লার উনুন। ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে আছে গোটা ঘর।

কম করে শ-পাঁচেক লোক থাকে এ-লাইনে। কেউ তাঁত ঘরে, কেউ সেলাই ঘরে, কেউ বা পাট ঘরে কাজ করে। ভোর হতে না হতে টাট্টিখানার সামনে মারামারি লেগে যায়। গোসলখানায় ছাতা পড়ে এমন পেছল হয়ে আছে যে পা পাতা যায় না। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে হামেশাই লোকের মাথা ফাটে। পাকাঘরের ঠিক কোল ঘেঁষে বারোয়ারি পেচ্ছাপখানা। ঝাড়ুদার দিনে একবার আসে। দুর্গন্ধে নাকে কাপড় দিতে হয়।

মোড়ে মোড়ে একটা করে চোখে ঠুলি পরানো বিজলি বাতির আকাশপ্রদীপ। কয়েক পা এগোলেই অন্ধকারে পথ হাতড়াতে হয়।

ডবল খাটুনি খেটে বাইরে দড়ির খাটিয়ার ওপর ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়েছিল ইয়াকুব। দ্বারভাঙায় দেশ তার। অন্ধকারে চোখ বুজে কী ভাবছিল জানি না। আমাদের সাড়া পেয়ে উঠে বসল ইয়াকুব। বলল—দেশে গ্রামঘরে হাজার হোক আলো হাওয়া আছে। কিন্তু যার জোতজমি নেই, দেশে তার ঠাঁইও নেই।

অকল্যান্ড মিলের দক্ষিণে এক গলি দিয়ে আসছি। হঠাৎ মাস্টারমশাই থেমে গেলেন।

শুনছেন? মেকানিক গোপাল মাঝি কাশছে।

শব্দ শুনলাম। পাঁজর ফেটে দমকে দমকে কাশির বেগ উঠছে। দাঁড়িয়ে থেকে শোনা যায় না। নিজেরই যেন দম বন্ধ হয়ে আসে।

পাটঘরে পাটের আঁশ গলায় গিয়ে গলা সুড় সুড় করে। যক্ষ্মারোগীদের কাশির সঙ্গে দলা দলা রক্ত ওঠে। পাশে যারা থাকে তারা দেখেও দেখে না। দু-দিন পর তাদেরও তো গলা দিয়ে রক্ত উঠবে। ছুটি চাইলে ছুটি পাওয়া যাবে না। কর্তাদের জানালে তক্ষুণি জবাব। মজুরের অসুখে এই হচ্ছে মালিকের দাওয়াই।

রোগ চেপে চেপে আজ একেবারে মরণদশা হয়েছে গোপালের। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। হাতে একটা পয়সা নেই যে ডাক্তার ডাকবে। এমনিতেই সংসার অচল হয়ে পড়েছে। আঁতপুর ইস্কুলের সেরা ছাত্র ছিল নেপালের ভাই কেষ্ট। ইস্কুল ছাড়িয়ে তাকে মিলিটারিতে জান দিতে পাঠানো হয়েছে। একজনের জান গিয়ে যদি পাঁচজনের জান বাঁচে। কিন্তু সেও আর কদিন?

গোলকধাঁধার মতো জগদ্দলের গলি। কোন্‌খান দিয়ে কোথায় গেছে কিছুতেই ঠাহর পাওয়া যায় না।

মিস্ত্রি হরি চক্কোত্তির ইট-খসা ভিটেটা পর্যন্ত বাঁধা পড়েছে। পয়সাওয়ালা লোক বলে চক্কোত্তিদের এককালে নামডাক ছিল। অবস্থা আজ একেবারে পড়ে গেছে। নইলে কি শেষটায় লাজলজ্জা ঘুচিয়ে কারখানায় কাজ নিতে হয়? ভাইয়ে ভাইয়ে কতই না বনিবনা ছিল আগে। আজ আর মুখ দেখাদেখি নেই। বাড়িতে পার্টিশান উঠছে। মন ছোটো হয়ে গেছে অভাবে।

অ্যাংলো-ইন্ডিয়া মিলে কাজ করত লছমী। কয়লার অভাবে কদিন ধরে কল বন্ধ। হাজারের ওপর মজুর বেকার হয়ে বসে আছে। কাজ না পেলে কেমন করে তারা বাঁচবে? লছমী সারাদিন রেললাইনে আর ইছাপুর ইয়ার্ডে ঘুরে ঘুরে পোড়া কয়লা কুড়িয়েছে। সেই কয়লা ফেরি করে সস্তায় বেচে যা দু-চার আনা পয়সা পেয়েছে, লছমী তাই নিয়ে চোরাবাজারে চলেছে চাল কিনতে।

হীরালাল বলে, ফুরোনের তাঁতিরা সুতো পায় না। পাবে কেমন করে? সব মিলেই স্পিনারের বেজায় অভাব। অন্য সব কারখানায় তারা বেশি মাইনের কাজ পাচ্ছে। কোন সুখে চটকলে থাকবে?

ডবল খাটুনিতে মজুরির হার কমেছে। কোনো কোনো কলে মিস্ত্রি আর তেলওয়ালাদের মজুরি টাকায় পাঁচ আনা অব্দি ছাঁটাই হয়েছে। মাকু ভাঙলে, বেল্ট ছিঁড়লে কোম্পানি বদলে দেয় না। কাজেই তাঁতিরা নিজেদের গরজে গাঁটের টাকা ভেঙে খেসারত দেয়। ঘুষ না দিলে সর্দার আর বাবুরা এক পা নড়বে না। যেমন কাজ তেমনি রেট ঘুষের। তিন মাসের বদলি কাজ পেতে হলে ঘুষ দিতে হবে কম করে দশ টাকা।

এদিকে কিস্তিবন্দি সুদের জন্যে কাবলিওয়ালা আজকাল দু-বেলা শাসিয়ে যায় সিদ্দিক মিঞাকে। বেচারার সাতখানা র‍্যাশন কার্ডের মধ্যে তিনখানা কার্ড টাকার অভাবে অমনি পড়ে আছে।

না খেয়ে উজাড় হচ্ছে চটকলের সাড়ে তিন লক্ষ মজুর। বছরে কোটি কোটি টাকার মুনাফা লুটছে চটকলের সাহেব আর দেশি মালিক।

গাঁ থেকে বেশি দিন হলো আসেনি পার্বতীয়া। গোড়ায় গোড়ায় লাইনে এত লোকের মধ্যে বড্ড বাধো বাধো ঠেকত তার। আস্তে আস্তে সবকিছু গা-সওয়া হয়ে গেল। কারখানার কাজে বেরোল পার্বতীয়া। না হলে সংসার চলে না। পেটে যদি খেতে না পায়, ইজ্জত ধুয়ে জল খাবে? কারখানায় জুলুম আছে অনেক। খাটায় বেশি, পয়সা দেয় কম। তার ওপর হজম করতে হয় সর্দার আর বাবুদের চড়-লাথি।

পার্বতীয়ার মুশকিল তার ছোটো ছেলেটাকে নিয়ে। ডবল শিফটে ঘরে ছেলে ককিয়ে মরে গেলেও দেখার কেউ নেই। ছেলেকে দুধ খাওয়াতে কারখানায় পাঁচ মিনিটেরও ছুটি পাওয়া যায় না। তাই যাবার সময় ছেলেটাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার জন্যে ছোট্ট ছেলেটার মুখে আফিং গুঁজে দিয়ে যায় পার্বতীয়া। আফিং খেয়ে মড়ার মতো পড়ে থাকে দুধের বাচ্চা।

রাস্তায় আগে যে বয়সের ছেলেরা সব খেলা করত, চাকা চালাত—সেই বয়সের ছেলেরা কেউ মিলিটারিতে বয় হয়েছে কিংবা ফুকানলিতে কাজ নিয়েছে। পাড়ার ইস্কুল পাঠশালায় মজুরদের পড়ুয়া ছেলে নেই বললেই চলে।

খয়রাতি ওষুধখানায় নবীয়ান বিবির দেড় বছরের মরো-মরো ছেলেকে দেখে ডাক্তার ঠোঁট উলটিয়ে বলে—দুধের ছেলেকে রেশনের চাল গিলিয়েছ, এখন বাঁচাই কী করে!

ঘরে ঘরে একই অসুখ। একে তো পুষ্টিকর কোনো খাওয়া নেই, তার ওপর কাঁকরভরতি পচা রেশনের চাল।

দাওয়াইখানার সামনে হাতে শিশি নিয়ে হইহল্লা করে মজুরের দল। তারা চটে গিয়ে বলে: একঠো ঢাকোসলা ঠারা করকে রাখা হ্যায়। কুছভি দাওয়া নেহি মিলতা, মিলতা স্রিফ পানি। লক্ষ্মীচাঁদ, নাথুনী, বিকাউ, সামরথী, আবদুল গনি, শ্যামা, মুরারি—সকলেরই সেই একই ইতিহাস। কারো যক্ষ্মা, কারো কুষ্ঠ। কারো ঘর ভেঙেছে, কারো ঘর ভাঙছে। তাদের ক্রুদ্ধ আক্রোশ চিমনির মুখে ধোঁয়ার মতো উঁচিয়ে ওঠে।

রাত্তিরে গরমের চোটে আর মশার কামড়ে যেদিন ঘুম আসে না, শুয়ে শুয়ে তারা গ্রামদেশের কথা ভাবে। বাপদাদার ভিটেটুকু ছেড়ে আসতে কষ্ট হয়েছিল খুব। দেনার দায়ে জমি লিখিয়ে নিয়েছিল গাঁয়ের মহাজন। পেটের ধান্ধায় চলে আসতে হলো শেষে শহরে। কতই না লোভ দেখিয়েছিল ফাগু সর্দার। চটকলের চাকরিতে দু-হাতে টাকা। চোদ্দো বছর ধরে খালি পেটে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে তারা চটকলের চাকরিতে কী মজা। সারাজীবন কাজ করেও চাকরি পাকা হয় না এখানে।

অত্যাচারে অত্যাচারে ভোঁতা হয়ে গেছে মানুষগুলো। মাঝে মাঝে তারা আগুনের মতো দপ করে জ্বলে ওঠে, ফস করে নিভে যায়। বিহারি, বিলাসপুরি, বাঙালি, মাদ্রাজি, ওড়িয়া। সাহেব মালিকরা তাদের আলাদা আলাদা করে রাখে। তারা এক হলে সাহেবদের যে সর্বনাশ।

সাঁইতিরিশ সালে একবার ডুবতে বসেছিল চটকলের সাহেবরা। গঙ্গার দু-পার জুড়ে তিন মাসের জন্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সমস্ত চটকল। মজুররা এক হয়ে হাত গুটিয়ে নিয়ে জারি করেছিল হরতাল।

সেসব দিনের কথা ভুলে গেছে কি চটকলের মজুর?

ফিরতে রাত্তির হয়ে যায় অনেক। রাস্তা খাঁ খাঁ করছে। তাড়িখানা বন্ধ। তার সামনে অসংখ্য মাটির ভাঁড় মুখ উলটে পড়ে আছে। গলিতে গলিতে গোপনে জুয়োখেলা চলেছে। একদল মাতাল হল্লা করে লাইনে ফিরছে।

ঘুমন্ত লাইন। মনে পড়ল মাস্টারমশাই, এরশাদ আর ইউনিয়ন অফিসের কথা। বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে তারা ডেকে তুলছে আচ্ছন্ন মানুষগুলোকে। বাংলার বুক থেকে ঠেলে সরিয়ে দেবে তারা অত্যাচারের সাদা জগদ্দল পাথর।

চাটগাঁয়ের কবিওয়ালা

কধুরখিল থেকে কাদা ভেঙে গোমদণ্ডী চলেছি।

জায়গাটা অজ পাড়াগাঁ। রাস্তার দুপাশে জঙ্গলের জটলায় আকাশ আছে কি নেই টের পাওয়া যায় না। দু-পা গেলেই একটা এঁদো ডোবা, তার একগলা শ্যাওলা। শুকনো পাতা জলে ভিজে বাতাসে পাঁক পাঁক গন্ধ।

এমন যে অজ পাড়াগাঁ, সেখানেও একটা করে চায়ের দোকান। কাঁচি সিগারেটের ছেঁড়া খালি প্যাকেট রাস্তার এখানে-ওখানে ছড়ানো।

যুদ্ধের আগে এমন ছিল না। সেপাই-পল্টনে সারা চাটগাঁ যে ছেয়ে গিয়েছিল। কাঁচা রাস্তা পাকা করবার কাজ পেয়েছিল হাজার হাজার মেয়েপুরুষ। গাঁয়ে গাঁয়ে বসেছিল নানান জিনিসের দোকানপাট। যুদ্ধ খতম হবার পর অন্য সব দোকান উঠে গেল। কিন্তু থাকার মধ্যে থেকে গেল শুধু চায়ের দোকান। এ ক-বছরে চায়ের নেশা চাষিদেরও পেয়ে বসেছে।

কাঁধ-ভাঙা কাচের গেলাসগুলোর গা দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা ঘোলাটে জল। গুড়ের নাগরীর মুখে বসেছে বোলতাদের গোলটেবিল বৈঠক। দুধের কড়াইটায় লোভ লাগার মতো মোটা সরের ওপর ভনভন করছে একঝাঁক মাছি। বাঁশের বাখারি জোড়া দিয়ে খদ্দেরদের বসবার উঁচু জায়গা। তবু চায়ের গেলাস মুখের একদম কাছে নিয়ে গেলেও নাকে এসে লাগে বাতাসের পাঁক পাঁক গন্ধ।

একটু এগিয়ে বাঁহাতে ছ্যাতলা-পড়া একটা সরু পায়ে-চলা রাস্তা। এই রাস্তার শেষে কবিয়াল রমেশ শীলের বাড়ি।

রমেশ শীলের নাম জানে না চাটগাঁয়ে এমন গাঁ নেই। রমেশ শীলের গান শুনতে শুনতে রাত যে কখন ভোর হয়ে যায়, কারো খেয়ালই থাকে না। কারো কারো ভাবের ঘোরে এমন হয় যে, জ্ঞান পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে।

ঘরে ঢুকলে প্রথমেই চোখ পড়ে দেয়ালের দিকে। মেঝে থেকে কড়িকাঠ অবধি চারপাশের দেয়ালে কাঠকয়লা দিয়ে লেখা অসংখ্য নাম আর সেই সঙ্গে নানা জায়গার ঠিকানা। গোটা গোটা অক্ষরে আঁকাবাঁকা করে লেখা। যারা লিখেছে, তারা যেন হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি আর ভালোবাসা উজাড় করে রেখে গেছে দেয়ালের গায়ে। আর দেয়ালটা যেন কবির কাছে দেশসুদ্ধ মানুষের দেওয়া মানপত্র হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

এক মুখ হাসি নিয়ে ঘরে ঢুকলেন গ্রাম্য কবি রমেশ শীল।

যা ভেবেছিলাম একটুও মিলল না। ভেবেছিলাম কবি যখন, তখন এত বড়ো লম্বা চুল হবে; মুখটা হবে খুব গম্ভীর, ভাবুক ভাবুক; গায়ে থাকবে লম্বাহাতা পাঞ্জাবি; আর কথা বলবে ছন্দের টানে হেঁয়ালির মতন করে।

ওমা, এ যে নেহাত আটপৌরে সাধারণ মানুষ। গায়ে হাতকাটা ফতুয়া। সারা গায়ে বার্ধক্যের বলিরেখা। রোদ্দুরে পোড়া তামাটে রং। অনেকখানি চওড়া কপাল। চুল উঠে যাওয়ার দরুন বোধহয় আরও বেশি চওড়া দেখায়। যাও বা চুল ছিল, এখন ধবধবে সাদা। হাসলে রমেশ শীলকে ঠিক দু-বছরের শিশুর মতো দেখায়।

ঘরের মেঝের একপাশে গাদা-করা শুকনো খড়। ঘরের দিকে তাকালে বেশ বোঝা যায় গরিব গেরস্থের সংসার। দারিদ্র্যকে চাপা দেবার কোনো চেষ্টা নেই।

মহা ফাঁপরে পড়লেন রমেশ শীল আমাদের দেখে। বিশেষ করে কলকাতার লোক। যত্নআত্তি না করলে ফিরে গিয়ে লোকের কাছে বলবে কী!

অনেক কষ্টে নিরস্ত করা গেল। এক কাপ চায়ের বেশি আর কিছু নয়—এই রফা হলো। পেতলের ঘটিতে করে চায়ের জল চাপিয়ে মেঝের ওপর উবু হয়ে তামাক সাজতে বসলেন রমেশ শীল।

বললাম কেমন করে গান বানাতে শিখলেন সেই গল্প আমাদের বলতে হবে।

টিকের আগুনে ফুঁ দিতে দিতে গল্প শুরু করলেন রমেশ শীল—

সে কি আজকের কথা? তখন বয়েস হবে বছর বাইশ। গাছপালার শিকড় দিয়ে ঘা সারানোর ব্যাবসা করতেন বাবা। আমিও শুরু করেছিলাম সেই পৈতৃক ব্যাবসা। কিন্তু তাতে মন বসছিল না আমার। লোকের দুঃখকষ্ট আর নানান চিন্তা মাথার মধ্যে ভিড় করে আসত।

সেবার জগদ্ধাত্রী পুজো। সদরঘাটে কবিগানের আসর হবে খবর পেলাম। গাইবেন চিন্তাহরণ আর মোহনবাঁশি। দুজনেই সেকালের নামকরা কবি। গিয়ে দেখি আসরের চারপাশে লোকে লোকারণ্য। গান শুরু হয়ে গিয়েছে। একজন দেন চাপান, একজন কাটান। এক-একটা কলি শোনে আর লোকে হইহই করে ওঠে ফুর্তিতে। কখনও মাথা ঝাঁকানি দিয়ে, কখনও দাঁড়িয়ে উঠে বাহবা দেয়।

সেই রাত্তিরে গান শুনে কবি হবার শখ আমায় পেয়ে বসল। তারপর দিন নেই রাত নেই, শুয়ে বসে আমার কেবল এক চিন্তা—কেমন করে ছন্দ আর মিল দিয়ে মনের কথা হাজার হাজার মানুষের কাছে বলা যায়। রাস্তা দিয়ে হাঁটি আর মনে মনে কথার সঙ্গে কথা মেলাই—‘মনে’র সঙ্গে ‘সনে’, ‘ভবে’র সঙ্গে ‘রবে’। মিলের জন্যে সবসময় ছটফট করে মন।

এদেশে তখন সবেমাত্র রেলের লাইন বসেছে। গরিব চাষিবাসির জায়গাজমি কিনে নিচ্ছে বিদেশিরা এসে। নদীর দুধারে ফেঁপে উঠছে বিদেশিদের কারবার। সেই রাগে প্রথম আমি আস্ত গান বানাই। দু-চারজন সেই গান শুনে খুব তারিখ করল।

পরের বছর পুজোর সময় আবার সেই কবিয়ালদের জলসা বসেছে। গান গাইতে গাইতে গোড়াতেই চিন্তাহরণের গলা হঠাৎ ভেঙে গেল। মহা মুশকিল। চিন্তাহরণ না গাইলে আসর মাটি হয়ে যায়। বায়না করা গান; পালা পুরো করতে না পারলে বেচারিদের অনেক টাকা গুনোগার দিতে হবে। কিন্তু চিন্তাহরণের গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না—এখন উপায়?

এমন সময় আসরের একপাশ থেকে কয়েকজন মুসলমান এসে জোর করে আমাকে টেনে তুলল। বলল, আসর মাটি হয়ে যায় তুমি ওঠো।

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে দেখি পা দুটো ঠকঠক করে কাঁপছে। সভায় দাঁড়িয়ে কবিগান করতে হবে ভাবলেই বুক শুকিয়ে যায়। তার ওপর শহর-বাজার জায়গা।

মোহনবাঁশি এসে পিঠ চাপড়ে বললেন, মেরে-কেটে দাদা রাত দশটা বাজিয়ে দাও, নইলে বায়নার টাকাটা মাঠে মারা যায়।

কী আর করব। যা থাকে বরাতে বলে কপাল ঠুকে উঠে দাঁড়ালাম।

গানের গোড়াতেই মোহনবাঁশি এমন যা তা বলে গালাগালি দিতে লাগলেন যে, রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। কথার তির দিয়ে মোক্ষম করে বিঁধলাম মোহনবাঁশিকে। গায়ের জ্বালায় মুখে যেন আপনা-আপনি কথা জুটে যেতে লাগল। জমে উঠল আসর। আমারও সাহস বেড়ে গেল।

এদিকে রাত দশটা কাবার হয়ে পরদিন সকাল দশটা বেজে গেল। আসর আর ভাঙতে চায় না। মোহনবাঁশিকে দুয়ো দিতে লাগল আসরের লোক—এতটুকু একটা ছেলের কাছে হিমসিম খাচ্ছে মোহনবাঁশি?

কিছুতেই কেউ কাউকে হারাতে পারছে না। কিন্তু একটা রফা তো হোক। কাঁহাতক আর আসরে বসে থাকা যায়? লোকে চ্যাঁচাতে লাগল—যোটক দাও, যোটক দাও।

যোটক দিতে জানলে তো আমি যোটক দেবো? মোহনবাঁশিরও রোখ চেপেছে নাবালক ছেলের কাছে যোটক সে কিছুতেই দেবে না। লোকে তখন আর উপায় না দেখে নিজেরাই আসর ভেঙে দিয়ে যে যার বাড়ি চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল—মোহনবাঁশির হার হয়েছে।

সেই থেকে আমার নাম লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে বায়না পেতে লাগলাম। শুরু করে দিলাম গানের ব্যাবসা।

—বলতে বলতে পুরোনো দিনগুলোর মধ্যে যেন রমেশ শীল হারিয়ে যান। জ্বলজ্বলে দুটো চোখ কোনদিকে তাকিয়ে আছে ঠিক বোঝা যায় না।

আমাদের দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে হুঁকোয় টান দিতে দিতে রমেশ শীল আবার শুরু করেন তাঁর জীবনকথা।

এ-গাঁয়ে সে-গাঁয়ে গান গেয়ে কাটল কয়েক বছর। একদিন তিনি শুনলেন মাঝভাণ্ডারের পিরের কথা। অবাক কাণ্ড! সেখানে নাকি গান দিয়ে সব উপাসনা হয়। চাটগাঁর নিজস্ব ভাষায় নিজস্ব সুরে গান হয় সেখানে।

পূর্ববাংলার লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ মুসলমান বছরের একটা সময় সেখানে এসে জড়ো হয়। পিরকে দেখে মজে গেলেন রমেশ শীল। একটানা সাত বছর তিনি সেখানে গান গেয়ে কাটালেন।

আরও অনেক নামকরা কবিওয়ালা মাঝভাণ্ডারে গান গেয়েছেন, কিন্তু রমেশ শীলের মতো এত জনপ্রিয়তা আর কেউ পাননি। হাজার হাজার লোক তাঁর গান শুনে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে, মূর্ছা গেছে। এখানে গান গাইবার জন্যে পুরাণ আর কোরাণের অনেক কিছু পড়তে শুনতে হয়েছিল তাঁকে। সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন ধর্মের জবানিতে। তাই পূর্ববাংলার সমস্ত মুসলমানের কাছে রমেশ শীলের আরেক নাম 'মাঝভাণ্ডারের মাঝি'।

কিন্তু মাঝভাণ্ডারে মন টিকল না রমেশ শীলের। গাঁয়ের দুঃখী মানুষগুলো যে তাঁকে ডাকছে।

সমাজে নানা রকমের অন্যায় আর অবিচার চলেছে। লোকের মধ্যে রয়েছে নানা রকমের কুসংস্কার। তার বিরুদ্ধে একা মাথা তুলে দাঁড়ালেন রমেশ শীল। অন্ধ মানুষগুলো তাঁর গান শুনে চোখে দৃষ্টি পেল।

স্বদেশি আন্দোলনের ঢেউ গাঁয়ে এসে যখন লাগল, তখন মেতে উঠলেন গ্রাম্য কবি রমেশ শীল। ক্ষুদিরামের ফাঁসি, পটুয়াখালির সত্যাগ্রহ—এইসব নিয়ে তাঁর বাঁধা গান লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় লোকের দুঃখদুর্দশা নিয়ে তিনি গান বাঁধলেন। এখনও তার একটা কলি তাঁর মনে আছে

পাঁচ গজ ধুতি সাত টাকা
দেহ টেকা হয়েছে কঠিন
রমেশ কয়, আঁধারে মরি
পাই না কেরোসিন।

তারপর সারা চাটগাঁ জুড়ে জ্বলে উঠল বন্দুক আর পিস্তলের আগুন। পুলিশের অত্যাচারে পুরো দু-বছর কবিগানের আসর বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু তাতে গান থামেনি। সূর্য সেন আর কল্পনা দত্ত, পাহাড়তলী আর জালালাবাদ নিয়ে তৈরি হয়েছে গান। সে গান পুলিশের চোখ এড়িয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে।

তারপর জোয়ার যখন নেমে গেল, তখন দেখা গেল চারিদিকে পাঁক জেগে উঠেছে। কবিগান আবার শুরু হলো বটে, কিন্তু সে গানের মধ্যে শুধুই কুরুচি আর কথার কচকচি।

রমেশ শীল তখন জেলার বাইশজন কবিওয়ালাকে নিয়ে একটা দল গড়ে তুললেন। সবাইকে একসঙ্গে করে তিনি এই প্রতিজ্ঞা নেওয়ালেন যে, কুরুচিপূর্ণ গান কেউ গাইবে না। যদি কেউ গায়, তাকে একঘরে করা হবে। হাতে হাতে তার ফল ফলল।

এর পর এল যুদ্ধ। ছারখার হতে লাগল চাটগাঁ। কবিওয়ালারা মহা ফাঁপরে পড়ল। পুরোনো গান আর লোকের মনে ধরছে না।

হুঁকোটা দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখে এক মুখ হাসি নিয়ে রমেশ শীল বললেন:

'মুনশিরহাটে হঠাৎ একটি চেনা ছেলের সঙ্গে দেখা। হাতে তার একটা কাগজ। তার ওপর লেখা 'জনযুদ্ধ'। ছেলেটি বলল—নিয়ে যান পরে পড়ে দেখবেন। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আগাগোড়া পড়লাম। দেশের কথা ঠিক এভাবে জানবার কখনও সুযোগ হয়নি। নতুনভাবে গান লিখতে মনে খুব উৎসাহ পেলাম। অনেকদিন ধরে ভেতরে ভেতরে কেমন যেন হাঁচর পাঁচর চলছিল। এতদিনে একটা রাস্তা পেয়ে গেলাম। ঠিক করলাম সারা

চাটগাঁয়ে এবার গান দিয়ে মানুষ জাগাব। তারপর গাঁয়ে গাঁয়ে নতুন গান নিয়ে গিয়েছি। লোকেও যেন ঠিক এমনি গানের জন্যেই এতদিন ওত পেতে বসেছিল। আমাদের গান তারা লুফে নিল।'

বলতে বলতে উঠে বসেন রমেশ শীল। কুঁচকে যাওয়া চোখেমুখে তাঁর জোয়ান বয়সের উদ্দীপনা।

ইচ্ছে ছিল না। তবু উঠতে হলো। অনেকগুলো গ্রামে যেতে হবে।

বললাম, চাটগাঁ শহরে তো আসছেন আপনি। আবার আমাদের দেখা হবে।

লাম্বুরহাটে ঘুরে ঘুরে একদিন হাটের দর জেনে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ একজন এসে বলল—দেখা করবেন ফণী বড়ুয়ার সঙ্গে?

ফণী বড়ুয়া হচ্ছেন রমেশ শীলের সবচেয়ে প্রিয় সাকরেদ। 'দেশ জ্বলে যায় দুর্ভিক্ষের আগুনে, তবুও দেশ জাগিল না কেনে'—তাঁর গানের এ দুটো কলি অনেককেই গুনগুন করতে শুনেছি।

হাটের মধ্যেই একটা ঘড়ি সারাবার দোকান। ঘরটা অন্ধকার। কেউ আছে কি নেই বোঝা মুশকিল। যেদিক থেকে ঠুক-ঠুক, ঠুক-ঠুক আওয়াজ আসছিল, সেই দিকে তাকিয়ে দেখলাম একটা লোক নীচু হয়ে হাতুড়ি ঠুকছে। মাথার চুলগুলো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া, দেখলে বয়স অল্প বলেই মনে হয়।

সঙ্গে যিনি ছিলেন, তিনি আলাপ করিয়ে দিলেন—ইনিই ফণী বড়ুয়া।

মুখে সর্বদা একটা লাজুক ভাব। গায়ে হাত গুটানো শার্ট। দেহে কিংবা মনে কোথাও জড়তা নেই। চাঁছা-ছোলা কথা, কোনো ঘোরপ্যাঁচ নেই। দেখেই ভালো লেগে যায় এমনি মানুষ।

একে হাটবার, তার ওপর খরিদ্দারের ভিড়। বেচারির ঘাড় তুলে কথা বলবার সময় নেই। কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটু করে কথা হলো।

'খুব ছেলেবেলাতেই আমার বাপ-মা মারা যান। ইস্কুলে পড়ার সুযোগ হয়নি। দিনগুলো কী কষ্টেই না কেটেছে। কিছুতেই কিছু ভালো লাগত না। ঠিক করলাম সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হব। অনেক দিন গিয়ে থাকলাম এক বৌদ্ধ মঠে। প্রথম প্রথম এত ভালো লাগত। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল, ততই বুঝতে পারলাম—পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এই ধর্মের জগৎটা বাইরের জগৎ থেকে আলাদা নয়। গেরুয়ার নীচে এখানেও মুখ লুকিয়ে আছে হাজার হাজার হুজরুকি। তাই গেরুয়াতেও বৈরাগ্য এল। আরাকান পেরিয়ে চলে গেলাম বর্মায়। সেখানেও বেশিদিন থাকতে পারলাম না। বাঁচার কোনো রাস্তা খুঁজে পেলাম না।

'আবার ফিরে এলাম দেশে। এক ঘড়ির দোকানে শিখতে লাগলাম কাজ। ওইটুকু একটা বাক্সর মধ্যে কত রকমের যে কলকবজা। দেখি আর আশ্চর্য হয়ে যাই। উড়ু উড়ু মন এতদিনে পায়ের নীচে মাটি পেয়ে গেল। সারাটা দিন চোখে মোটা কাচের ঠুলি লাগিয়ে কাজ করি আর রাত্তিরে এ-গাঁয়ে সে-গাঁয়ে কবিগান শুনে বেড়াই।

'দিনগুলো নেশার মতো কাটে। গুনগুনিয়ে গান করি আর ঘড়ির বাক্সের মধ্যে আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখি। হঠাৎ একদিন নিজের মনের ভেতর থেকে গান বেরিয়ে এল। কী যে ভালো লাগল সেদিন। এমনি করে ক্রমে গান বাঁধতে শিখে গেলাম। দু-একটা আসরে গান গেয়ে কিছুটা নামও হলো।

'গাঁয়ে গাঁয়ে গান গেয়ে বেড়াতে পারলে আর আমি কিছু চাই না। কিন্তু যেতে পারি কোথায়? ঘাড়ের ওপর বড়ো সংসার। গান গেয়ে যা রোজগার হয়, তাতে এ-বাজারে চলে না। তাই ইচ্ছে থাকলেও দোকানের কাজটা ছাড়তে পারি না। কাজটার ওপর মায়াও পড়ে গেছে।'

তারপর ঘাড়টা উঠিয়ে লাজুক লাজুক মুখের ভাব করে ফণী বড়ুয়া বললেন:

'ছেলেটাও হয়েছে এমন, আমাকে ছেড়ে কিছুতেই থাকতে পারে না। দু-দিন চোখের আড়াল হয়ে থাকলে আমারও মন ছটফট করে।'

এমন সময় একদল খরিদ্দার এসে ভিড় করে দাঁড়াল। জায়গা না দিলে তারা বসতে পায় না। কাজেই বিদায় নিয়ে উঠতে হলো।

ফিরে আসবার আগের দিন চাটগাঁ শহরে হিন্দু-মুসলমানের এখটা বড়ো জমায়েতের ব্যবস্থা হয়েছে। বক্তৃতার শেষে কবিগান। মূল গায়েন রমেশ শীল আর ফণী বড়ুয়া। গান শুনতে শহর ভেঙে লোক এসেছে।

চেয়ার-টেবিল নামিয়ে মঞ্চ খালি করে দেওয়া হলো। তার ওপর ফরাস বিছিয়ে বসল একদল দোহার; একপাশে বড়ো ঢোলক আর কাঁসরঘণ্টা।

বেজে উঠল ঢাক আর কাঁসর। বাজখাঁই গলায় ঢাকের দ্রাম-দ্রা-ম দ্রিম-দ্রাম-দ্রাম-দ্রিম আর তার মাঝখানে ঠ্যাঁ-ই ঠ্যাঁ-ই করে কাঁসরের সরু ক্যানকেনে আওয়াজ।

উঠলেন রমেশ শীল। ঢাক আর কাঁসর থেমে গেল। চারিদিকে একটা থমথমে ভাব। দেখে চিনতেই পারি না। রমেশ শীলের এ যেন এক অন্য চেহারা। ঝোড়ো কাকের মতো সাদা চুলগুলো আলুথালু হয়ে হাওয়ায় উড়ছে। চোখ দুটো মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে। শরীরের রেখায় রেখায় যেন বিজলির চমক। দেখে কে বলবে বাষট্টি বছরের বুড়ো।

সাধারণ মানুষের ভূমিকায় নেমেছেন ফণী বড়ুয়া আর মজুতদার সেজেছেন রমেশ শীল। একটার পর একটা গান হচ্ছে। চাপান আর কাটান।

কিন্তু এ এক নতুন ধরনের কবির লড়াই। এর মধ্যে ব্যক্তিগত গালাগালি নেই, অর্থহীন কথা কাটাকাটি নেই—শুধু আছে দুটো আদর্শের মধ্যে ক্ষমাহীন সংগ্রাম।

চোখের পর্দায় ভেসে উঠছে একের পর এক ছবি। আরাকানের রাস্তায় ঘরমুখো লক্ষ লক্ষ প্রবাসীর রক্তাক্ত পায়ের মিছিল। রাঙামাটিতে বোমা পড়ে, বোমা পড়ে পতেঙ্গায়, বোমা পড়ে কাছারির পাহাড়ে। সোনার দরে ধান বিকোয়, ধানের দরে জান বিকোয়—শহরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গাঁয়ের মানুষ। রাস্তায় রাস্তায় জমে ওঠে মরা মানুষের হাড় আর মাথার খুলি। না খেতে পেয়ে হাত-পা ফুলে যায়, ঘা-পাঁচড়ায় দগদগ করে সারা শরীর। মনের মধ্যেও পচ ধরে।

এরপর গোটা হল জুড়ে একটি জিজ্ঞাসা গমগম করে ওঠে—চাটগাঁর মানুষ মরবে কি?

ঢাক আর কাঁসর জলদ সুরে বেজে উঠে তোলপাড় করে তোলে যারা শুনছে তাদের মন। গায়ের লোমগুলো সকলের খাড়া হয়ে ওঠে। মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে রক্তের জোয়ারে। হঠাৎ থেমে যায় বাজনা।

চড়া গলায় শপথের মতো হুংকার শোনা যায়—না, মরবে না। হলসুদ্ধ মানুষ ধনুকের ছিলার মতো উঠে দাঁড়ায়। না, মরবে না চট্টগ্রামের মানুষ। ভাই ভাই হাত মিলিয়ে তারা ভেঙে দেবে পরাধীনতার ষড়যন্ত্রকে। বজ্রের কানে তালা ধরিয়ে আওয়াজ উঠতে লাগল—হিন্দু মুসলিম এক হও।

শুকনো বারুদে আগুন লাগিয়ে গান শেষ হয়। কিন্তু সভা ভেঙেও ভাঙতে চায় না। হল আর মঞ্চ ভিড়ের চাপে এক হয়ে গেছে। তাকিয়ে দেখি সেই জনসমুদ্রে ডুবে গেছে রমেশ শীল আর ফণী বড়ুয়া। অনেক চেষ্টা করেও তাদের খুঁজে পেলাম না।

মেঘের গায়ে জেলখানা

মেঘের গায়ে জেলখানা। বিশ্বাস হয় না? দেখে এসো বক্সায়।

হাওড়া থেকে ট্রেনে উঠলে তিন দিন তিন রাত্তিরের পথ। ঢিকোতে ঢিকোতে যাবে প্যাসেঞ্জার ট্রেন। থামবে সাহেবগঞ্জে। যেতে যেতে চোখে পড়বে সাঁওতাল পরগনার বেঁটেখাটো পাহাড়। বুঝতেই পারবে না কখন ছাড়িয়ে এসেছ বাংলাদেশ। সাহেবগঞ্জ থেকে ট্রেন বদলিয়ে সকরিগলি ঘাট। পারানির স্টিমারে সেখান থেকে মণিহারি ঘাট। ঢেউ দেখে ভক্তি হবে এমন গঙ্গা। রাত্তিরে স্টিমারের সার্চলাইটের আলোয় হঠাৎ দেখবে এক আশ্চর্য কাণ্ড। ওপারের উঁচু বাঁধের ওপর আলো পড়তেই একটা ধবধবে সাদা লাইন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল—যতটুকু আলো, ঠিক ততটুকু জায়গা জুড়ে দেওয়ালির পোকার মতো ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে সাদা বক না বলাকা? সার্চলাইটের কড়া আলোয় ওরা ভেবেছে বুঝি সকাল হয়ে গেল। এমনি করে সারা রাস্তা পাখিদের ভুল বোঝাতে বোঝাতে স্টিমার গিয়ে ভিড়ল মণিহারি ঘাটে।

তল্পিতল্পা নিয়ে হুড়মুড়িয়ে আবার ট্রেনে ওঠা। পূর্ণিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে যেতে কখন দেখবে আবার বাংলাদেশে পৌঁছে গেছ। তুমি যেখানেই যাও বাংলাদেশ তোমাকে টেনে নেবে।

মেঠো রাস্তার ওপর দিয়ে কাতারে কাতারে চলেছে মানুষ। মাথায় রংবেরঙের পাগড়ি। গোরুর গাড়ির ছইয়ের ওপর লালনীল কাগজের নিশান। আকাশে ঠেলে উঠেছে চাকায়-তাড়ানো ধুলো। ছোট্ট ছোট্ট পিলে-মোটা ছেলেদের হাতে তালপাতার ভেঁপু। মেলা থেকে তারা ফিরছে, একটু এগোলেই তা বোঝা যায়। স্টেশনের কাছেই একটা মাঠে চনচনে রোদ্দুরে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু ছাতি আর ছাতি। উবু হয়ে বসা আড়ালের মানুষগুলোকে দেখা গেল না। একটা কিছু তামাসা হচ্ছে সেখানে। চারপাশে তাঁবু পড়েছে। গমগম করছে সারা তল্লাট।

দিন গিয়ে রাত। রাত গিয়ে দিন। হিমালয়ের কোলের কাছে ঘেঁষে এল রাস্তা। বর্ষায় পাহাড়ের গা বেয়ে ঢল নামে, জলের তোড়ে ভেসে আসে বড়ো বড়ো পাথর আর নুড়ি। শীতকালে জল শুকিয়ে গেছে। ঢালু মাটিতে জেগে রয়েছে চিত্রবিচিত্র বড়ো বড়ো পাথর আর নুড়ি। স্টেশনগুলোর মজার মজার নাম। তিব্বতিদের দেওয়া। এককালে বাঘের উপদ্রব ছিল, নাম তাই বাঘডোগরা। হাতির অত্যাচার ছিল, তাই হাতিঘিষা। শিকারের ভালো জায়গা, নাম নকসালবাড়ি।

মাঠের মধ্যে ছোট্ট শহর শিলিগুড়ি। চারদিকে পাহাড়তলীর অরণ্য—তরাইয়ের গভীর জঙ্গল। তার মাথার ওপর ঢেউয়ের মতো চলে গেছে একটার পর একটা পাহাড়। শিলিগুড়ি পেরিয়ে একটু ডান দিকে ঠিকরে গেল রাস্তাটা। সামনেই একটা লম্বা যেমন-তেমন কাজ-চালানো গোছের পুল। নীচে দিয়ে গেছে খরস্রোতা তিস্তা। লেপচারা বলে রংতু বা সিধা নদী। বড়ো বড়ো পাথর আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের গুড়ি খড়ের কুটোর মতো ভেসে চলেছে তার ক্ষুরধার জলে।

যেতে যেতে ছোট্ট একটা নেহাৎ নগণ্য স্টেশনে গাছপালার ভেতর দিয়ে আকাশের কপালের কাছটায় সোনার টায়রার মতো ঝলমল করে উঠল কী ওটা? একদল চেঁচিয়ে উঠল—কাঞ্চনজঙ্ঘা। সকালের সোনালি রোদ্দুর এসে পড়েছে বরফে মোড়া পাহাড়ের চুড়োয়। সেদিকে তাকিয়ে চোখের পলক পড়তে চায় না। যুগ যুগ ধরে দাঁড়িয়ে দেখতে ইচ্ছে করে সেই দৃশ্য।

গাড়ি এসে থামে রাজাভাতখাওয়ায়। স্টেশনের গায়ে চায়ের ছোট্ট দোকান। বেঁটে বেঁটে কাচের গেলাস। গেলা যায় না এমন বিশ্রী চা। তারই দাম দু-আনা। বাইরের উটকো লোক। কাজেই দাঁও মেরে নেবে।

হঠাৎ দোকানদারের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখবে ঠোঁটে আলতার রং, কামানো মুখে পেন্টের দাগ আর চোখে টানা কাজল। চোখেমুখে রাত জাগার সুস্পষ্ট ছাপ। জিজ্ঞেস করতে হবে না, সে নিজেই বলবে—কাল আমাদের এখানে থিয়েটার ছিল কি না। আমাকে আবার ধরেছিল ফিমেল পার্ট করবার জন্যে।

আ মরণ, এই হাড়গিলে চেহারায় আবার ফিমেল পার্ট! কিন্তু দু-মিনিটেই ভাব হয়ে যাবে লোকটার সঙ্গে। বাড়ি তার যশোরের কোনো একটা গাঁয়ে। দেশ ভাগ হবার পর হাঘরে হয়ে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে ঠেকেছে। ছোট্ট জায়গা। হয় রেল, নয় চা আর কাঠের চালানি কারবারের সঙ্গে জড়ানো এখানকার জীবন। খেলা নেই, সিনেমা নেই। মাঝে মাঝে মেরাপ বেঁধে শখের থিয়েটারে যা একটু-আধটু বৈচিত্র্য।

যতদূর চা বাগান, ততদূর পিচ-ঢালা মোটরের রাস্তা। সামনে ধোঁয়ার মধ্যে দেখা যায় কালো কালো কবন্ধের মতো পাহাড়।

মিলিটারি মেজাজে হু হু শব্দে চলবে ট্রাক। মনে হবে এই বুঝি হুমড়ি খেয়ে পড়বে পাশের হাঁ করা গড়ানো জমিতে।

যেতে যেতে দুপাশে চায়ের সবুজ পাতি। বেতের ঝুড়ি পিঠে বেঁধে কাজ করছে কুলিকামিনেরা। মুখের হাজার রকমের গড়ন। কেউ সাঁওতাল, কেউ ওরাঁও, কেউ কোচ, কেউ পলিয়া। পুরুষদের হাঁটুর নীচে কারো কাপড় নেই। কারো কারো খালি গায়ে শুধু একটা সরু নেংটি। পাতা দিয়ে ছাওয়া ছোট্ট ছোট্ট ঘর। কোনো রকমে মাথা গুঁজে থাকে। শুকনো শুকনো মুখ, সরু পাটকাঠির মতো শরীর।

মাঝে মাঝে সাহেবদের রংচঙে বাংলো। সামনে কেয়ারি করা ফুলের বাগান। দেউড়িতে দাঁড়ানো ঝকঝকে তকতকে আনকোরা নতুন গাড়ি। হঠাৎ তোমার চোখ বড়ো বড়ো হয়ে যাবে—ইংরেজরা এদেশ ছেড়ে আজও যায়নি?

ভাবতে ভাবতে জানতেই পারবে না কখন তুমি পার হয়ে এসেছ চা-বাগানের চৌহদ্দি। হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি খেয়ে রাস্তার দিকে চোখ পড়বে তোমার। পিচ নয়, খানাখন্দে ভরতি মাঠ ভাঙা রাস্তা। অসংখ্য ছোটো ছোটো কাঠের সাঁকো। কোনোদিকে পরোয়া নেই, তারই ওপর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে ট্রাক। ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে যাবে।

তারপর বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ তোমাকে ঢেকে দেবে ডুয়ার্সের বাঘ ডাকা অরণ্য। দুপাশে গভীর শালবন। গা-ছমছম করা নির্জন ছায়াচ্ছন্ন রাস্তা। এখানে চেঁচিয়ে মরে গেলেও কেউ জানবে না। যতদূর দৃষ্টি যায়—না মানুষ, না বসতি। জঙ্গল যেন ফুরোতে চায় না।

দূরে পাহাড়ের যে-মাথাটা দেখা যাচ্ছিল সেটা আর চোখে পড়ছে না। রাস্তার দিকে তাকাতেই দেখা গেল মাটি নয় আর। কেবল বড়ো বড়ো পাথর আর নুড়ি। সামনে গণ্ডারের পিঠের মতো কালো একটা দেয়াল। রাস্তাটা ক্রমেই ওপরের দিকে উঠছে। আর মোটরের ইঞ্জিনে কানে তালা ধরানো একটা প্রচণ্ড গোঁ গোঁ আওয়াজ ক্রমেই পঞ্চমে চড়ছে। একটু পরেই বোঝা গেল আমরা আর সমতলে নেই, পাহাড়ের গা বেয়ে উঠছি।

খানিকটা ওঠার পর তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা জায়গায় এসে হঠাৎ ইঞ্জিনটা একেবারে চুপ করে গেল। গাড়ি যাবে না আর। সামনে একটা কাঠের ফলকে লেখা : ‘সান্তালবাড়ি’। সামনে সশস্ত্র পুলিশের ফাঁড়ি। এখান থেকে বক্সা আরো দু-মাইল। চড়াই উজিয়ে যেতে হবে।

ততক্ষণে তোমাকে ছেঁকে ধরেছে ময়লা আলখাল্লা পরা একদল ভুটিয়া ছেলেমেয়ে। তোমার ভারী ভারী বাক্স বিছানাগুলো তারা বয়ে নিয়ে যাবে। তাদের চেহারার দিকে তাকালেই বুঝবে অসম্ভব গরিব তারা। তিন-চার বছরের রোগাপটকা ছেলেমেয়েদের কাঁধে ক্যানেস্তারার টিন। তার মধ্যে করে তারা মহাজনদের সওদা বয়। সারা দিন মোট বয়ে যা পায় তাতে পেটের ক্ষিধেটাও ভালো করে মেটে না। হাড়-লিকলিকে শরীরের মধ্যে শুধু পায়ের ডিমগুলো যা একটু মোটা।

থাকে ওরা পাহাড়ের অনেকখানি উঁচুতে ছোটো ছোটো গাঁয়ে। খুব কষ্ট করে বেঁচে থাকতে হয়। গাঁগুলোতে লোকও তাই খুব কম। একটু সুযোগ পেলেই পুরুষেরা সব কাজ নিয়ে চলে যায় পুলিশ কিংবা পল্টনে। যারা পড়ে থাকে, তারা কেউ ছুতোর মিস্ত্রি, কেউ কাঠুরিয়া, কেউ ঘরামি, কেউ মোট বওয়ার কাজ করে।

এবার এক পাহাড় ছেড়ে আর একটা পাহাড়ে উঠতে হবে। খানিকটা জঙ্গলের রাস্তা। পাহাড়ের এককেটা খাঁজের কাছে গিয়ে ঘুর রাস্তার আড়াআড়ি গেছে সোজা রাস্তা—চোরবাটো। উঠতে উঠতে হাঁফ ধরে যায়।

খানিকটা উঠে রাস্তার একটা বাঁক ঘুরতেই কানে আসবে ঝির ঝির শব্দ। একটানা নিস্তব্ধতার পর হঠাৎ চমকে যেতে হয়। দেখা না গেলেও কাছেই কোথাও ঝরনা আছে। এতক্ষণ একটা পাখির ডাক পর্যন্ত শোনা যায়নি।

ঝরনার জল যেখান দিয়ে গেছে, তার ওপর দিয়ে কাঠের একটা পুল। পুল পার হয়ে খানিকটা এগিয়েই দু-একটা কাঠের ঘর দেখা গেল। ডাকঘর, জলকল আর বনবিভাগের অফিস।

একটা ছোট্ট খোলা মাঠের ঠিক আগে তেমাথায় এসে হারিয়ে গেল সেই রাস্তা। একটা রাস্তা উঠে গেল সামনে জয়ন্তী পাহাড়ে, অন্য রাস্তাটা বাঁদিকে বেঁকে গেল ভুটান পাহাড়ের গা বেয়ে সোজা তিব্বতের দিকে। মাসখানেকে যাওয়া যায় লাসায়।

ডানদিকে কাঁটাতারে ঘেরা জেলখানার চৌহদ্দি। গেটের সামনে চৌকি দিচ্ছে বন্দুকধারী সেপাই।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দেখবে কুয়াশার মতো কালো পর্দায় সমস্ত দিক ঢেকে গেল। সামনের লোকটাকেও আর দেখা যাচ্ছে না। মুহূর্তে আবার সব পরিষ্কার। যেন কোনো যাদুকরের খেলা।

ও কিছু নয়, মেঘ। অনবরত আসছে আর যাচ্ছে। সেই মেঘের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বক্সার জেলখানা। সমুদ্রের পিঠের ওপর আধমাইল লম্বা একটা কাঠের পোল যদি সোজা করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তার মাথা বরাবর হবে এই জেলখানা।

কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে সবুজ ঘাস আর কাঁকরে মেশা ছোট্ট মাঠ। মাঝখানে মাঝখানে মাথা-উঁচু করা সাদা সাদা আখাম্বা পাথর। বেড়ার পুবদিকে জয়ন্তী পাহাড়ে যাবার রাস্তায় ছোট্ট একটা কাঠের পুল। তার নীচে দিয়ে গেছে একটা শুকনো ঝরনা।

জেলখানাটা পাহাড়ের তিনতলা সমান একটা হাঁটুর ওপর। মাঠের গা দিয়ে উঠেছে পাথরের সিঁড়ি। সিঁড়িটা যেখানে শেষ হয়েছে, ঠিক তার মুখে বড়ো একটা লোহার ফটক। ছোট্ট একটা গেট খুলে যাবে, তার ভেতর দিয়ে মাথা বাঁচিয়ে হেঁট হয়ে ঢুকতে হবে। বাঁদিকে জেলের অফিস, সেপাইদের ব্যারাক, চুনোপুঁটিদের কোয়ার্টার।

তিন-তিনটে ফটক পেরিয়ে তবে জেলের অন্দরমহল। হঠাৎ দেখবে তোমার সামনে আকাশ ছাড়া কিছু নেই। কাঁটাতারে বেঁধা হলেও তবু তো আকাশ। আকাশের আর এক কোণে দেখবে পাহাড়ের আর একটা হাঁটুর ওপর এক-একটা গাছ তার মরা ডাল নিয়ে দাঁড়িয়ে।

পাহাড়ের তিনটে খাঁজ। সারি সারি ঘর প্রত্যেকটা খাঁজে। পুরু পাথরের দেয়াল, রং করা কাঠের ছাদ। ছাদের কাছ-বরাবর গরাদ-আঁটা গোরুর চোখের মতো জানলা। ডবল দরজা—মোটা কাঠের আর পেটা লোহার। সামনে কাঁটাতারে ঘেরা ছোট্ট ছোট্ট উঠোন।

ভেতরে যত কাঁটাতার আছে, সমস্ত এক করলে লম্বায় কয়েক মাইল হবে। আঁকাবাঁকা অনেকগুলো রাস্তা। দিনের বেলায় আলো ঝোলানোর পোস্টগুলো দেখলে ঠিক মনে হবে ফাঁসির মঞ্চ। দেয়ালের বাইরে একশো হাত অন্তর উঁচু করে তৈরি সেন্ট্রি-বক্স। তার ওপরে দাঁড়িয়ে দিন নেই রাত নেই পাহারা দেয় বন্দুকধারী সেপাই। বক্সা বন্দিশিবির দেখতে অনেকটা হিটলার জার্মেনির কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের মতো।

জেলখানা না দেখলে দেশের একটা বড়ো দিক অদেখা থেকে যায়। আর জেল বলতেই মনে পড়ে আলিপুর, প্রেসিডেন্সি কিংবা দমদমের কথা। প্রথম যারা সাজা খাটে, তাদের জন্য আলিপুর-নিউ সেন্ট্রাল। যারা বাস্তুঘুঘু, জেলের ভাষায় যাদের বলে বি ক্লাস—তাদের জেল প্রেসিডেন্সি।

প্রকাণ্ড একটা চাবির রিং গলায় ঝুলিয়ে একটা দাড়িওয়ালা সেপাই কেবলি চরকির মতো ঘুরছে—একবার এ-গেট খুলছে, একবার ও-গেট। রাম-দুই-তিন বলে লোক ঢোকাচ্ছে আর বার করে দিচ্ছে। পাছে ভুল হয় তাই দুবার তিনবার করে গুনছে। মানুষগুলো যেন তার কাছে অঙ্কের একেকটা চিহ্ন ছাড়া কিছু নয়।

ভেতরে ঢুকেই দেখবে দেয়ালের গায়ে ছাপার মতো হরফে লেখা অনেকগুলো পোস্টার। গির্জার সামনে যেমন মথি লিখিত সুসমাচার লেখা থাকে তেমনি। তাতে লেখা আছে, চুরি করা মহাপাপ।

ছোটো কল্কেয় চোখ রাঙিয়ে সাধুচরণ সেদিকে তাকায় আর হাসে। ছেলের নাম রাখার সময় সাধুচরণের বাপ কি ভাবতে পেরেছিল, তার ছেলেটা বড়ো হয়ে এমন করে নাম হাসাবে? গায়ে মাংস নেই সাধুচরণের। বছর পঞ্চাশ বয়েস। জয়নগরের কাছে এক অজ গাঁয়ে তার বাড়ি। ছেলেবেলায় বাপ-মা মরে যায়। আত্মীয়দের বাড়িতে জায়গা হয়নি। পেটের জ্বালায় ছিঁচকে চুরি শুরু করে। হাতেনাতে ধরা পড়ে জেল হয়। জেল থেকে বেরোয় পাকা সিঁধেল চোর হয়ে। তারপর থেকে কতবার যে জেলে এসেছে তার ইয়ত্তা নেই। মাঝে একবার

মন হয়েছিল ঘর-সংসার করার। চোরাই পয়সায় কিছু জায়গাজমিও কিনেছিল। বিয়ে করেছিল, একটা ছোট্ট ছেলেও আছে তার। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও তাকে ভালো থাকতে দেয়নি রোজ রাত্তিরে প্রহরে প্রহরে চৌকিদারের খবরদারি। যেখানে যা কিছু হোক থানায় সাধুচরণের ডাক পড়বে। মোটা রুলের গুঁতো খেয়েও রেহাই নেই, গাঁটের কড়িও বেশ কিছু খসাতে হবে। মিছিমিছি এই জ্বালাতন পোড়াতনের চেয়ে চুরি করে জেলের ভাত খাওয়াই ভালো মনে করেছে সে। তবে ছেলেটার জন্যে আজকাল বড্ড মন কেমন করে। তাছাড়া শুকনো পড়ে আছে অতটা জমি। ছেলের নাম তার বিশে। গাঁয়ের লোকে ঠাট্টা করে বলে—চোট্টা সাধুর ছেলে হবে নির্ঘাত বিশে ডাকাত।

ইয়ার্ডে ইয়ার্ডে ভাগ করা জেলখানা। সেপাই-কয়েদিরা ইয়ার্ডকে বলে খাতা। সাত খাতার নীচে কিলবিল করছে পঙ্গপাল। জেলের ভাষায় বলে, ছোকরা ফাইল। কেউ ছিঁচকে চোর, কেউ পকেটমার। এরা সব সাধুচরণের অতীত, সাধুচরণ এদের ভবিষ্যৎ। গা শিউরে উঠবে দেখলে। আধো আধো কথা বলবার, ইস্কুলে ভরতি হবার বয়স। মানুষ করতে পারলে যাদের কেউ হতো ইঞ্জিনিয়ার, কেউ মাস্টার, কেউ লেখক—তারা বড়ো হচ্ছে পকেট কাটার জন্যে, নিরীহ মানুষের গলা কাটার জন্যে। অধিকাংশই অনাথ শিশু, শহরের ফুটপাথে মানুষ। পাঠশালায় নয়, গুন্ডার দলে এদের হাতেখড়ি।

এদের মধ্যে একজনের নাম মুস্তাফা। ছোট্ট ফুটফুটে ছেলে, বছরদশেক বয়েস। দুনিয়ার কাউকে যেন কেয়ার করে না এমনি ভঙ্গি নিয়ে চলাফেরা করে। এন্টালির ওদিকে কোনো ইস্কুলে পড়ত। বাপ তার রাজমিস্ত্রির কাজ করত। হঠাৎ একদিন তিনতলা উঁচু বাঁশের ভারা থেকে পা পিছলে পড়ে মুস্তাফার বাপ মারা গেল। মাইনের অভাবে মুস্তাফার নাম কাটা গেল ইস্কুল থেকে। বিধবা মা, বড়ো সংসার, অনেকগুলো ছোটো ছোটো ভাইবোন। বস্তিতে থাকত এক পকেটমারের সর্দার। টাকার লোভ দেখিয়ে সে দলের খাতায় মুস্তাফার নাম লিখিয়ে নিল। এরই মধ্যে মুস্তাফা বারচারেক পকেট মেরে জেলে এসেছে। 'ইস্কুলে যেতে ইচ্ছে করে না?' জিজ্ঞেস করলে বলে, 'ইচ্ছে করলেই কি যাওয়া যায়?'

জেলখানা একটা আলাদা জগৎ। চোর-ডাকাত-খুনি-গাঁটকাটা—এই নিয়ে উঁচু পাঁচিল তোলা এখানকার জীবন। আলো-হাওয়ার সঙ্গে আড়ি। আজব এখানকার ভাষা—না বাংলা, না হিন্দি। তেমনি ছিরি এখানকার জীবনের। জানোয়ারের পালের মতো খোঁয়াড়ের মধ্যে ঠাসাঠাসি করে বাঁচা। সূর্যদেব পাটে বসতেই সঙ্গে সঙ্গে লকআপ—ঘরে ঢুকিয়ে তালাবন্ধ। রাত ফরসা হবার সঙ্গে সঙ্গে খোঁয়াড় খুলবে। সার বেঁধে দাঁড়াতে হবে ফাইলে। গুনতি হবে, গুনতি মেলার তিন ঘণ্টা পড়বে। সেলাম বাজাতে হবে জেলার জমাদারকে। পান থেকে চুন খসলেই পিঠে ডান্ডা কিংবা লোহার নাল মারা বুটের লাথি।

এছাড়াও আছে কেসটেবিল। কারও নামে নালিশ হলেই ডাক পড়বে কেসটেবিলে। কথায় কথায় ডিগ্রিবন্ধ, মার্কাকাটা, কম্বল ধোলাই কিংবা মাড়ভাত। কয়েদি দুরস্ত করবার হাজার ব্যবস্থা। ছোট্ট ছোট্ট নির্জন কুঠুরিকে বলে ডিগ্রি। চারিদিক বন্ধ, কারো মুখ দেখা যাবে না। বন্ধ দরজার নীচে সরু ফাঁক দিয়ে ছুঁড়ে দেবে ঠান্ডা খাবারের সানকি। মাসের পর মাস এমনি করে থাকতে হবে। কিংবা পায়ে পরিয়ে দেবে ভারী লোহার বেড়ি। বছরে তিন মাস সাজা মাপ করার নিয়ম আছে—তাকে বলে মার্কা। কর্তাদের মন জোগাতে না পারলে মার্কা কাটা যাবে। কম্বল দিয়ে সর্বাঙ্গ মুড়িয়ে লাঠি পেটা করার নাম কম্বল-ধোলাই। জেলখানায় হামেশাই হয়।

ভেতরে ঢুকে মনে হবে যেন মধ্যযুগের একটা প্রকাণ্ড কারখানা। জেলের সব কাজ করানো হয় কয়েদিদের দিয়ে। শুধু জুতো সেলাই নয়, হাড়ি-মেথরের কাজ থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সবই। তাছাড়া আছে দড়িচাল্লি,

ধোবিচাল্লি, ঘানিকর, মিস্ত্রিঘর, ছাপাখানা, গোয়ালঘর, তরকারি বাগান—এমনি হরেক রকম ডিপার্ট।

কেনা গোলামের মতো কয়েদির দল বিনা মজুরিতে উদয়াস্ত এখানে খাটে। একটু ফাঁক পেলেই কয়েদিরা সেপাইদের দিকে নলচে আড়াল করে বসে নেশা করতে, অন্য একদল বসে যায় তিন তাসে জুয়ো খেলতে। সবাই পারে না। যারা সর্দার গোছের, হাতে পয়সা আছে—জেল তাদের মুঠোয়। দুনিয়া টাকার বশ—এ তারা জানে। জানে বলেই তারা জেলে এসেও দল পাকায়, অন্য দলের লোককে ভাংচি দিয়ে দলে টানে।

কিন্তু অবাক কাণ্ড। জেলখানায় পয়সা? আইনে তো নেই! আইনে নেই বলেই টাকা রাখবার মজার কল করেছে তারা। তাছাড়া চোরের রাজত্বে যেখানে সেখানে টাকা রাখলেই বা থাকবে কেন? তাই নিজেদের গলার মধ্যে বানিয়ে নিয়েছে টাকা রাখার থলি। সেই থলির মধ্যে টাকা রেখে দিব্যি তারা নিরাপদে খায় দায় ঘুমোয়।

গলার মধ্যে থলি বানাতে কষ্ট আছে। ভারী একটা সিসের বল অনেকদিন ধরে গলার টাকরার কাছে রেখে দিতে হবে। যতই দিন যাবে ততই মাংস ছ্যাঁদা হয়ে সেটা বসে যেতে থাকবে। ভেতরটা দগদগে ঘা হয়ে যাবে। অসম্ভব যন্ত্রণা। কাছাকাছি কেউ দাঁড়াতে পারবে না এত দুর্গন্ধ। বছরখানেক কাঁচা অবস্থায় থাকবে ঘা। তারপর সেই সিসের বল তুলে নেওয়ার পর ঘা যখন শুকিয়ে গেল তখন তৈরি হল গলার থলি। তার মধ্যে অনায়াসে সোনা-গিনি লুকিয়ে রাখো। কারো সাধ্য নেই টের পায়।

এরা ছাড়াও জেলখানায় একদল অভিজাত শ্রেণির কয়েদি আছে। খাবার জিনিসে বিষ মিশিয়ে বিক্রি করেছে কেউ, কেউ করেছে নোট জাল কিংবা ব্যাংকের লাখ লাখ টাকা চুরি—দিব্যি ভদ্রলোক সেজে তারা বুক টান করে ঘুরে বেড়ায়। কর্তামহল তাদের আপনি আজ্ঞে করে, সাধারণ চোর-ছ্যাঁচড়রা তাদের সমীহ করে চলে। বড়োলোকের এবং বড়ো ঘরের ছেলে এরা। ট্রাম-বাসে পকেট মারেনি, ব্যাংকের টাকা চুরি করে হাজার হাজার গরিব বিধবার সংসারকে এরা পথে বসিয়েছে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছুরি দেখিয়ে এরা কারো হাত থেকে টাকার থলি ছিনিয়ে নেয়নি, খাবার জিনিসে বিষ মিশিয়ে দোকানে দোকানে সেই বিষ হাজার হাজার মানুষের হাতে বিলি করেছে। ছোটোলোক নয় এরা। ইস্কুল-কলেজে পড়েছে। পেটেও টান পড়েনি কোনোদিন। এমন নরম মন যে রক্ত দেখলে মূর্ছা যায়। তাই হাজার মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েও, শত সহস্র ছাপোষা সংসারকে পথের ফকির করে দিয়েও জেলে গিয়ে তারা সুখে আছে। কেননা তাদের বড়ো ঘর, বনেদি বংশ—তারা সুয়োরানির ছেলে। আর যারা পেটের জ্বালায় পথ চলতি লোকের পকেট মেরেছে কিংবা জমি হারিয়ে পাইক বরকন্দাজদের সঙেগ লাঠালাঠি করেছে তাদের জন্যে অনন্ত নরকবাসের ব্যবস্থা। কেননা তারা গরিব, সাধারণ মানুষ—দুয়োরানির ছেলে। জেলখানায় অসহ্য লাগে অপরাধের তুলনায় শাস্তির এই হেরফের।

কিন্তু এদের কারো জন্যেই তৈরি হয়নি বক্সা বন্দিশিবির। এ হচ্ছে এক বিশেষ জেলখানা।

দু-যুগ আগে ইংরেজ প্রথম তৈরি করেছিল এই জেল তার পুরোনো কেল্লায়। ভুটানের কাছে লম্বা মেয়াদে ইজারা নেওয়া এই জায়গা। আরও ঘন জঙ্গল ছিল আগে। এখনও পাহাড়ের গায়ে শোনা যায় বাঘের ডাক। এখানকার মাটিতে ফণা তুলে ঘুরে বেড়ায় বিষধর সাপ। বায়ু দূষিত করা জঙ্গলের হাওয়া ডন-কুস্তি করা জোয়ান শরীরকেও কাঁপিয়ে দেয়। ঝরনার জলে পিকনিক করছে রোগের জীবাণু। কাছেপিঠে বাজার নেই। অগ্নিমূল্য সব জিনিস। বাড়াবাড়ি অসুখ হলে ওষুধ অভাবে, হাসপাতাল অভাবে অবধারিত মৃত্যু।

নিজের দেশকে যারা ভালোবাসে, তাদের আপন প্রিয়জনদের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে সেদিন দূর দেশান্তরে বনবাস দেবার ব্যবস্থা করেছিল ইংরেজ সরকার। আকাশের বুক চিরে দিয়েছিল তারা কাঁটাতারে,

সেপাইদের হাতে লাঠির বদলে তুলে দিয়েছিল টোটাভরা বন্দুক।

আজ ইংরেজ নেই, তবু তার আগের ব্যবস্থাই বহাল আছে বক্সায়।

দেশকে ভালোবাসা ছাড়া কোনো অপরাধই যাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হয়নি, আজও তাদের স্থান বক্সায়। আজও অনেকে এখানে আছেন, দু-যুগ আগেও যাঁরা এখানে ছিলেন। আছেন বয়োবৃদ্ধ খাঁসাহেব আর নীরদ চক্রবর্তী, আছেন ভগ্নস্বাস্থ্য শিবশঙ্কর মিত্র। যাঁর জীবন বাংলার অর্ধশতাব্দীব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিগর্ভ ইতিহাস, সেই সতীশ পাকড়াশীও এখানে।

আর আছে বাংলার শহর-গ্রামের অগণিত মানুষের বিশ্বস্ত বহু প্রতিনিধি।

যারা দুরন্ত পৌঁছে দিয়েছে উজ্জ্বল সম্ভাবনার খবর, যারা নুয়ে পড়া ধানের শীষগুলোকে বর্শার ফলকের মতো সাহসে টান করে দিয়েছে, চিমনির ধূমায়িত মুখে যারা তুলে দিয়েছে আগুনের ভাষা—ভুটানের গায়ের পাহাড়ে তারা বন্দি।

বাংলার মানচিত্রে খুঁজে পেলেও সে দেশ বাংলা নয়। ইংরেজের ঘুঘু চরানো ভিটেয় নির্বাসিত হয়ে আছে ভবিষ্যতের আশায় উন্মুখ আমার বাংলা।

হাত বাড়াও

শীতকালে শুধু পায়ের পাতাটুকু ডোবে এমন নদী তিস্তা। হেঁটে পার হবার সময় পেছনে যদি তাকাও দেখবে আকাশের পিঠে পিঠ রেখে হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে আছে প্রকাণ্ড এক দৈত্য। আসলে দৈত্য নয়, হিমালয় পাহাড়।

নন্দীগ্রামের এক অখ্যাত গাঁয়ে নোনা-লাগা তালগাছের বন পেরিয়ে আকাশের কোলের কাছে প্রথমে ছোট্ট একটা ফোঁটা, তারপর আস্তে আস্তে তালগাছের মতো বড়ো হয়ে উঠল কী ওটা? আগন্তুক এক জাহাজের মাস্তুল। আর সামনের বালিয়াড়ি পেরিয়ে ধু ধু করে উঠল নীল সমুদ্র। বঙ্গোপসাগর।

এই আসমুদ্রহিমাচল আমার বাংলা—পর্বত যার প্রহরী, সমুদ্র যার পরিখা।

ফরিদপুরের গাড়ি আসতে তখনও অনেক দেরি। রাজবাড়ির বাজারে বসে আছি। পাতলা কুয়াশায় মোড়া পঞ্চাশের আকালের এক সকাল। একটু দূরে স্টেশনের রাস্তায় মিলিটারি ছাউনির পাশে একটা অদ্ভুত জন্তু দেখলাম। আস্তে আস্তে চার পায়ে এগিয়ে আসছে। চেনা কোনো জন্তুর সঙ্গে তার মিল নেই। কুয়াশার মধ্যেও জ্বল জ্বল করছে তার দুটো চোখ। একা থাকলে ভয়ে মূর্ছা যেতাম। কেননা সেই চোখের দৃষ্টিতে এমন এক মায়া ছিল, যা বুকের রক্ত হিম করে দেয়।

আরও কাছে এগিয়ে এল সেই মূর্তি। রাস্তার ধুলো থেকে কী যেন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। তার জ্বলন্ত দুটো চোখ কুয়াশায় কী যেন খুঁজে খুঁজে ফিরছে। ঠিক মানুষের হাতের মতো তার সামনের দুটো থাবা। আঙুলগুলো যেন আগার দিকে একটু বেশি সরু। গায়ে একটুও লোম নেই। কোন জন্তু?

সামনাসামনি আসতেই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। অমৃতের পুত্র মানুষ। বারো-তেরো বছরের উলঙ্গ এক ছেলে। মাজা পড়ে গেছে। হাঁটতে পারে না। তাই জানোয়ারের মতো চার পায়ে চলে। বাজারের রাস্তায় খুঁটে খুঁটে খায় চাল আর ছোলা।

ছুটে পালিয়ে এলাম স্টেশনে। কিন্তু আজও সেই দুটো জ্বলন্ত চোখ আমাকে থেকে থেকে পাগল করে। দু-হাতে সোনা ছড়ানো নদীমালার দিকে তাকিয়ে তার নিশ্বাস শুনি। সরু লিকলিকে আঙুল দিয়ে সেইসব খুনিদের সে শনাক্ত করছে—শহরে গ্রামে বন্দরে গঞ্জে জীবনের গলায় যারা মৃত্যুর ফাঁস পরাচ্ছে, মাথা উঁচু করে বাঁচতে দিচ্ছে না যারা মানুষকে।

সেই দুটি জ্বলন্ত চোখ শান্তি চায়। বাংলার বুক জুড়ে সবুজ মাঠের সোনালি ফসলে, চাষির গোলাভরা ধানে ভরে উঠুক শান্তি। কারখানায় কারখানায় বন্ধনমুক্ত মানুষের আন্দোলিত বাহুতে বাহু মেলাক শান্তি। যুদ্ধ নয়, অনাহারে মৃত্যু নয় আর। কোটি কোটি বলিষ্ঠ হাতে এবার স্বাধীন সুখী জীবন, এবার শান্তি।

যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষের ঘনায়মান অন্ধকারে দুটি জ্বলন্ত চোখ জেগে আসমুদ্রহিমাচল এই বাংলায় পাহারা দিচ্ছে আর মাটি থেকে দুটো হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দু-পায়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে সে। তোমরাও হাত বাড়াও, তাকে সাহায্য করো।

পর্ব : দুই

প্রবন্ধ রচনা রীতি, নির্দেশিকা ও নমুনা

প্রবন্ধ রচনারীতি প্রসঙ্গে

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নবপ্রবর্তিত পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিতে প্রথাগত প্রবন্ধ রচনার দীর্ঘদিনের গতানুগতিক চর্চা থেকে সরে আসা হয়েছে। কেননা এই স্তরে শিক্ষার্থীর লেখা প্রবন্ধের মধ্যেই নিজস্ব চিন্তা, ভাষাগত দক্ষতা, ভাবনার স্বচ্ছতা বিশদে প্রতিফলিত হওয়ার সুযোগ থাকে। তাই প্রবন্ধ লেখার প্রচলিত কৌশলের সঙ্গে নতুন ভাবনা এবং আঙ্গিকের মেলবন্ধন ঘটানো হয়েছে। প্রবন্ধের যে চারটি ধরন রাখা হয়েছে, তারা পরস্পরের থেকে আলাদা কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই যুক্তি ও কল্পনা, ভাব ও ভাষা এবং অর্জিত জ্ঞান ও তা প্রকাশের সামর্থ্য পরীক্ষিত হবে। সাধারণত প্রবন্ধ লেখার প্রস্তুতি হিসেবে যে সমস্ত তথ্য শিক্ষার্থীরা মুখস্থ করে আসে, সেই সমস্ত তথ্য সে প্রশ্নের মধ্যেই পাবে। শুধু প্রয়োজন হবে নিজের ভাষায় গুছিয়ে লেখার পরিকল্পনা ও দক্ষতা। মানস-মানচিত্র কিংবা তথ্য-সূত্র অনুসারী প্রবন্ধে বিষয়-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ভাব আর তথ্য যেমন দেওয়া থাকবে তেমনই বিতর্কের আদলে কোনো একটি বক্তব্যের পক্ষে বা বিপক্ষের মতটি সে প্রশ্নপত্রের মধ্যেই পাবে, শুধু প্রতিযুক্তি দিয়ে এর বিরুদ্ধ মতটিকে তাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আবার কোনো একটি বিষয়ের প্রস্তাবনা অংশটি পড়ে নিয়ে, বুঝে, সেই বিষয়টিকে সুস্পষ্ট আলোচনার মাধ্যমে সম্পূর্ণতা দান করতে হবে। প্রবন্ধের এই চর্চা যেহেতু অভিনব তাই এর বিভিন্ন ধরনের সুস্পষ্ট নির্দেশিকা ও নমুনা প্রয়োজনীয়। এই কথা মনে রেখেই নির্দিষ্ট চার ধরনের জন্য নির্দেশিকা এবং নমুনা দেওয়া হলো।

❋ **রচনা লেখার বিষয়টি এক লাইনে না দিয়ে একটি মানস-মানচিত্র এবং তথ্য সম্ভার দেওয়া হবে। পরীক্ষার্থীরা সেই মানচিত্র এবং প্রয়োজনীয় তথ্য ব্যবহার করে/অনুসরণে কম-বেশি ৪০০ শব্দের মধ্যে একটি প্রবন্ধ রচনা করবে।**

এই ধরনের প্রবন্ধ লেখার আগে যে বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে—

- মানস-মানচিত্রে দেওয়া ভাবনা বা তথ্যসম্ভার ক্রমানুসারে ব্যবহার না করে নিজের স্বাধীনতা অনুসারে কাজে লাগানো যাবে।
- লেখার সময় বিষয় এবং তথ্য অনুসারে মৌলিক চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ঘটাই বাঞ্ছনীয়।
- লেখার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মানস-মানচিত্রে দেওয়া নেই অথচ বিষয়-সংশ্লিষ্ট এমন কোনো নতুন ভাবনা বা তথ্য যেমন ব্যবহার করা যাবে, তেমনই কোনো তথ্য বা ভাবনা পুনরুক্তিমূলক হলে তা পরিহার করা যাবে।
- মানস-মানচিত্রে দেওয়া কোনো একটি ভাবনা বা তথ্য বিষয়ে নিজের মনে অস্পষ্টতা থাকলে সেটিকে ভুলভাবে ব্যবহার না করে, এড়িয়ে যাওয়াই সমীচীন।
- প্রবন্ধের শৈলী, সৌন্দর্য, নিজস্বতা এবং পরিণতিবোধ সবসময়েই বিশেষ গুণ বলে বিবেচিত হবে।
- নির্ধারিত শব্দসংখ্যার কথা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। এই নিয়ম ১০ শতাংশ শিথিলযোগ্য।

নমুনা :

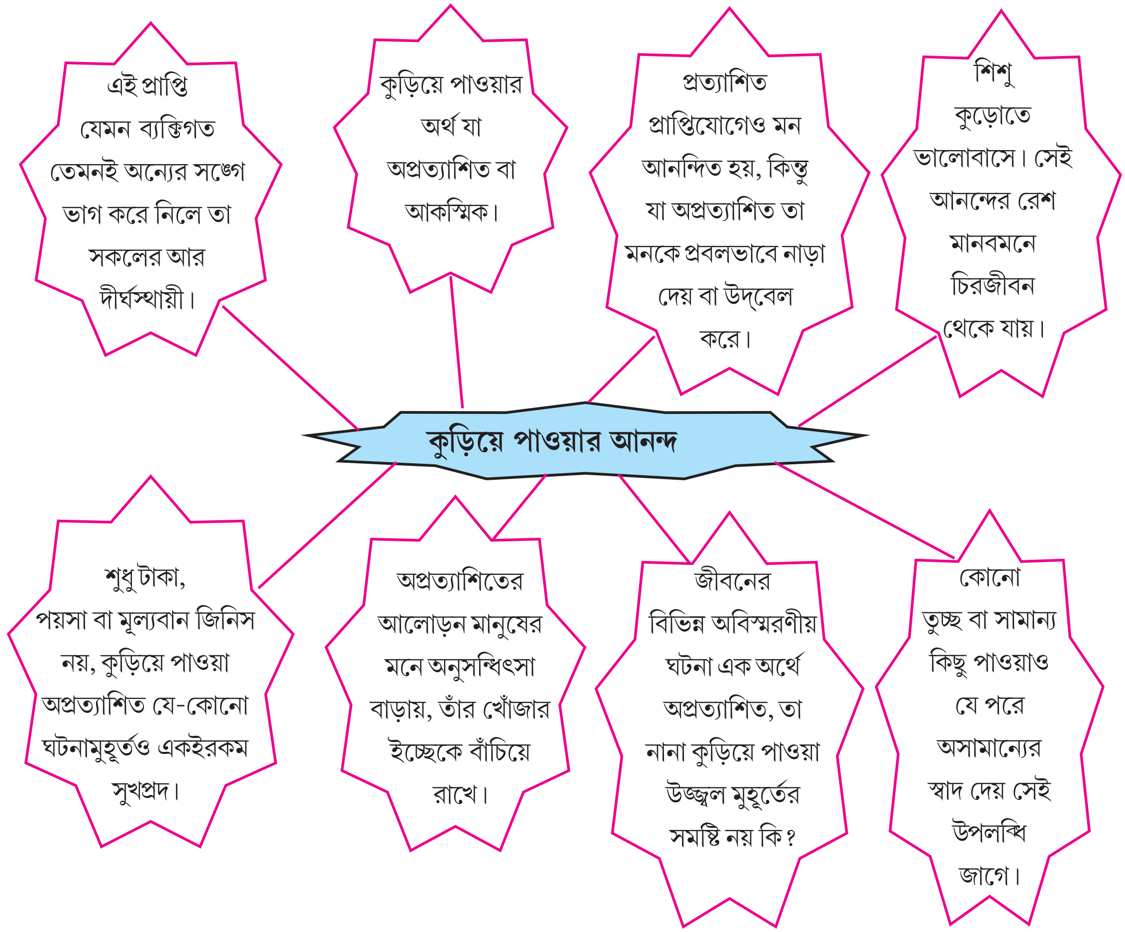

কুড়িয়ে পাওয়ার আনন্দ

সে অনেক ছোটোবেলার কথা। তখন প্রাইমারি স্কুলে পড়ি। কোনো কোনো দিন বাড়িতে টিফিন খেতে আসি। কোনো কোনো দিন বাড়ি থেকে টিফিন নিয়ে যাই। তবে সবচেয়ে মজা হয় যেদিন দু-এক টাকা বড়োদের কাছ থেকে জুটে যায়। সেদিন ইচ্ছেমতো কিনে খাওয়ার অবাধ আনন্দ! আজ রচনা লিখতে বসে এমনই একটা দিনের কথা প্রথমে মনে পড়ল। সাদা শার্ট আর ঢোলা খাঁকি হাফ প্যান্ট পরে স্কুলে চলেছি। মনটা টগবগ করে ফুটছে, কেননা প্যান্টের ডান পকেটে রয়েছে একটা লাল চকচকে দু টাকার নোট। বারবারই মনে হচ্ছে কখন টিফিন টাইম আসবে, ঝাল ছোলা কিংবা আলুকাবলি না কি বাদামচাক! এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে জোরে পা ফেলে এগোচ্ছি হঠাৎ দেখি স্কুলেরই একটা অচেনা ছেলে ছুটতে ছুটতে আসছে, হাতে ধরা দু টাকার নোট। 'তোমার পকেট থেকে পড়ে গেছে, এই যে'—ততক্ষণে আমার হাত চলে গেছে প্যান্টের পকেটে, টাকাটা ওখানে নেই; রয়েছে অচেনা রতনের হাতে। একই সঙ্গে হারানোর দুঃখ আর পরমুহূর্তেই ফিরে পাওয়ার

আনন্দে আমি আত্মহারা, স্তব্ধবাক। এই ঘটনাই, শুধু তো টাকা নয়, সেদিন থেকেই আমায় প্রাণের বন্ধু রতনকেও পাইয়ে দিয়েছিল। এরপর থেকে দুজনে মিলে পথে, ঘাটে, মাঠে, জঙ্গলে কতকিছু কুড়িয়ে বেড়িয়েছি, কুড়িয়ে পেয়েছি; তার সবকিছু আজ আর মনেও পড়ে না। তবে সেইসব স্যাঁতসেঁতে ডাকটিকিট, তামার এক পয়সা, সোনালি পালক, ক্ষয়া বল প্রভৃতি কুড়িয়ে পাওয়ার অদ্ভুত অসামান্য আনন্দ আজও বুকের মধ্যে ভিড় করে। বড়ো হতে হতে রতনের সঙ্গে সঙ্গে জিনিসগুলি হারিয়েছি কিন্তু সেই অপ্রত্যাশিত আনন্দের রেশ স্মৃতিতে একইরকম রয়ে গেছে। এখনও রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় এদিক-ওদিক চোখ যায়। লোকলজ্জা আর ব্যস্ততার ভয়ে চাইলেও কোনোকিছু কুড়োতে পারি না। ছোটোদের কুড়োতে দেখে আনন্দ হয়। আর আমি নিজে হাতে কুড়িয়ে নিতে না পারলেও আমার মন টুকরো টুকরো কত ছবি কিংবা ঘটনা কুড়িয়ে নিয়ে জমা করে রাখে! শৈশবের সেই অভাবনীয় আনন্দের রেশ রয়ে গেছে বলেই তো এখনও মন যেন ঘরে-বাইরে কিছু একটা খোঁজে, কিছু একটা কুড়িয়ে পাওয়ার কথা ভাবে! রবীন্দ্রনাথের একটা গানের কথা মনে পড়ে—

‘হারিয়ে যাওয়া আলোর মাঝে কণা কণা কুড়িয়ে পেলেম যারে
রইল গাঁথা মোর জীবনের হারে।
সেই-যে আমার জোড়া-দেওয়া ছিন্ন দিনের খণ্ড আলোর মালা
সেই নিয়ে আজ সাজাই আমার থালা—’...

এর সবটা আমি বুঝি না। কিন্তু এটুকু মনে হয় যা অপ্রত্যাশিত তা প্রত্যাশিত নয় বলেই তো কদাচিৎ হাতের নাগালের মধ্যে ধরা দিয়ে হারিয়ে যাওয়ার আগে কখনো-কখনো চিরস্থায়ী ছাপ ফেলে যায়। একমাত্র মানবমনই জানে কুড়িয়ে পাওয়া কোনো ঘটনার স্মৃতি অনেক বছর পরেও আমার বন্ধু রতনের হাতের দোদুল্যমান দু-টাকা কিংবা ক্ষয়া কালো বল হয়ে ফিরে ফিরে আসে। জীবনের হারে গাঁথা স্মৃতিতে উজ্জ্বল মায়া হয়ে রয়ে যায়।

এই কুড়িয়ে পাওয়ার আনন্দ যে সন্ন্যাসীর মনকেও আলোড়িত করে তা নিয়ে একটি সুন্দর গল্প বলেছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলি। এক বৌদ্ধ শ্রমণ শুনিয়েছিলেন রাস্তায় পয়সা কুড়িয়ে পাওয়াতে না কি খুব আনন্দ! এই কথা শুনে তাঁর মনে হলো একবার পরীক্ষা করেই দেখা যাক। তিনি ভিক্ষায় পাওয়া কয়েকটি পয়সা নিয়ে বারবার ছড়িয়ে দেন এবং কুড়োন। কিন্তু তাঁর মনে কোনোরকম আনন্দ হয় না। তখন নিজের মনেই ভাবেন তবে সবাই যে বললে কুড়িয়ে পাওয়ায় ভারি মজা, তাঁরা তো কেউ ঠকানোর লোক নয়! এরপর ফের ছড়াতে এবং কুড়োতে শুরু করলেন। এইভাবে চলতে চলতে শেষটায় সবকটাই ঘাসের ভেতর পড়ে হারিয়ে গেল। এবার বহুক্ষণ ধরে খুঁজে যখন ফিরে পেলেন তখন চিৎকার করে উঠলেন এখন বুঝেছি। কিছু কুড়িয়ে পাওয়ায় অবশ্যই আনন্দ আছে।

❋ **কোনো একটি বিষয়ে কোনো একজন লেখকের লেখার একটি অংশ দেওয়া থাকবে। প্রদত্ত অনুচ্ছেদটি হলো রচনার প্রস্তাবনা বা ভূমিকা। এই প্রস্তাবনা বা ভূমিকাটিকে অবলম্বন করে পরীক্ষার্থী বিষয়বস্তুর গভীরে প্রবেশ করবে এবং পরিণতি দান করবে।**

এই ধরনের প্রবন্ধ লেখার আগে যে বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে—

- প্রশ্নপত্রে প্রদত্ত অনুচ্ছেদটিকে মূল রচনার প্রস্তাবনা বা ভূমিকা হিসেবে গ্রহণ করে পরবর্তী অংশে সেই ভাবটিকে বিশ্লেষণ করতে হবে।
- প্রবন্ধ রচনার সময়ে মূল লেখাটি যে গ্রন্থের অন্তর্গত, তা পড়া না থাকলেও অসুবিধা নেই।
- প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্যের সমর্থনে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি ও সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান ব্যবহার করা যাবে।
- প্রবন্ধের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যেন তার নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও রূপরেখাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
- সমাজ-সমস্যামূলক প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রতিকারের পথগুলিও উল্লেখ করতে হবে।
- প্রবন্ধের শব্দসীমার প্রতি অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে।

নমুনা :

পশ্চিমবঙ্গের হস্তশিল্প : কাঁসা-পিতলের কথা

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পচেতনায় হস্তশিল্পের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। হস্তশিল্পের সবচেয়ে বড়ো কথা হলো এই যে, তা কোনোদিনই বড়ো শিল্পের পরিপূরক নয়—তা আপন বিশেষত্বে সমুজ্জ্বল। হাতের ছোঁয়াই সেখানে বড়ো কথা—বড়ো কথা তার রং, নকশা ও সর্বোপরি শিল্পীর প্রতিভা। হস্তশিল্পই একমাত্র নিদর্শন, যেখানে প্রতিভার সঙ্গে ধর্ম ও কলা বা আর্ট এবং শিল্প এক হয়ে গেছে।

বিষ্ণুপুর, খড়ার কী বহরমপুরের রাস্তায় যেতে যেতে কোনো একটা পাড়ার কাছে আসলেই আপনার কানে আসবে কাঁসার বাসন পেটানোর আওয়াজ। কলকাতার বড়োবাজারের একটি বড়ো পট্টিতে দেখবেন শুধু পুরানো বাসনই কেনাবেচা হচ্ছে কত। এ শিল্পটি আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে আছে বহুদিন ধরে। কাঁসা-পিতল পশ্চিমবাংলার কুটিরশিল্পগুলির মধ্যে অন্যতম বৃহৎ শিল্প।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় নানান কুটিরশিল্প গড়ে উঠেছে, যাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ডোকরা শিল্প, গজদন্তশিল্প, পুতুলশিল্প, রেশম ও তসরশিল্প, মৃৎশিল্প, পটশিল্প, নকশি কাঁথাশিল্প, শোলাশিল্প, ডাকের সাজ, শঙ্খচিল, মিষ্টান্নশিল্প, দারুশিল্প, দেশি বাদ্যশিল্প, ছবি-বাঁধাই, ফুলের গয়না তৈরি, ধোকড়া শিল্প, মুখোশ শিল্প, বাঁশের কাজ, কাঁসা ও পিতলের কাজ, কাঠ খোদাই, ফিলিগ্রির কাজ, সূচের কাজ, মাদুর শিল্প, পুঁতিশিল্প, ঝিনুকের কাজ, বেতশিল্প, পাট ও মেখলির কাজ, বিড়ি শিল্প, সুতি ও পুঁতির গয়না (ম্যাক্রম) শিল্প, চর্মশিল্প প্রভৃতি।

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই কংসবণিকেরা বসবাস করে থাকেন। বহু মানুষ কাঁসা-পিতলের বংশানুক্রমিক ব্যাবসার মাধ্যমেই জীবনধারণ করেন। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর; মুরশিদাবাদের খাগড়া; মেদিনীপুরের ঘাটাল, মনোহরপুর, আজুড়, খড়ার, মহিষাদল; বর্ধমানের বনপাশ, দাঁইহাট, বেগুনখোলা; হুগলির বাঁশবেড়িয়া, আরামবাগ; নদিয়ার মুড়োগাছা, মতিহারি, নবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে কলকাতার বাজারে কাঁসা-পিতলের বাসনপত্র এসে থাকে। কলকাতার কাঁসারিপাড়ায় চাদরের বাসন তৈরি হয়।

মুরশিদাবাদে নবাবি আমল থেকে নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিকশিত হয় হাতির দাঁতের কাজ, শোলা, বালাপোশ, কাঁসা-পিতলের কাজ। শিল্পীদের হাতের কাজ তাঁদের রুচি আর সৌন্দর্যবোধকে তৃপ্ত করত। এই নবাবি আমলেই কংসবণিক সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ মুরশিদাবাদের কান্দি আর খাগড়ায় বসতি স্থাপন করেন। খাগড়াই থালা, বাটি, গ্লাস, কটকি থালা, গোলাপপাতা ডিশ, শঙ্খ পদ্ম ডিশ, চিরমারি বগি তৈরির পাশাপাশি ডিশের উপর বিভিন্ন মূর্তি গড়ে তোলার পারদর্শিতাও শিল্পীরা দেখিয়েছেন।

বীরভূম জেলাতেও কাঁসা-পিতলের কাজ অত্যন্ত প্রাচীন একটি শিল্প। এই জেলার চাকদহ, জয়দেব-কেন্দুলি, খয়রাশোল, নারায়ণপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এই শিল্পের বিস্তার লক্ষ করা যায়।

পুরুলিয়া জেলার কাশীপুর ব্লকের তালাজুড়ি, মণিহারা, সুতাবই, রাউতাড়া, মানবাজার ১নং ব্লকের গোপালনগর, ভুতাম প্রভৃতি অঞ্চলে কাঁসা-পিতলের থালা, গ্লাস, বাটি, কলশি প্রভৃতি তৈরি হয়। মালদার ইংলিশ বাজার, কলিগ্রাম, কুতবপুরে কাঁসা-পিতল ও ভরণের জিনিসপত্র তৈরি হয়। বনেদি পরিবারে এখনও এদের কদর আছে। কাঁসা আর পিতল তৈরি হয় তামা, দস্তা আর টিন দিয়ে। কখনও বা এই কাজে অল্প পরিমাণ সিসে ব্যবহার করা হয়ে থাকে নির্মীয়মান জিনিসটিকে নরম করার প্রয়োজনে। কাঁচামালের অধিকাংশ জিনিসই বিদেশ থেকে আনা হয়। কপার কর্পোরেশন গড়ে ওঠার পর থেকে এদেশেও কিছু পরিমাণ তামা শিল্পের প্রয়োজনে পাওয়া যায়। পুরানো, ভাঙা বাসনপত্র অল্প দামে বিক্রি হয়ে থাকে। কখনও তা গলিয়ে নিয়ে, আবার কখনও বা সম্পূর্ণ নতুনভাবে বাসন তৈরি করা হয়ে থাকে। অ্যালুমিনিয়াম আর স্টেইনলেস স্টিলের বাসনের রমরমার যুগে সাবেকি আমলের কাঁসা-পিতল ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। মানুষের মধ্যে কাচ, চিনেমাটির জিনিস ব্যবহারের প্রবণতায় কাঁসা-পিতলের ব্যাবসা ক্রমশ হারিয়ে যেতে বসেছে। অতীত ঐতিহ্য ভুলে বংশানুক্রমিক ব্যাবসা ছেড়ে বাধ্য হয়ে ব্যবসায়ীরা অন্য ব্যাবসায় চলে যাচ্ছেন। পুঁজির অভাব, কাঁচামালের দামবৃদ্ধি, মানুষের রুচির পরিবর্তন ও চাহিদার হ্রাস, মহাজনি শোষণ, উন্নত প্রযুক্তির অভাব প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কাঁসা-পিতল শিল্পী-ব্যবসায়ীদের পিছনে ঠেলে দিচ্ছে।

অথচ, এমন একটা সময় ছিল, যখন নিম্নবিত্ত পরিবারে কাঁসা-পিতলের বাসনকে অস্থায়ী সম্পত্তির মতো মনে করা হতো। কারণ যে-কোনো সময়েই তার একটা নির্ভরযোগ্য বিক্রয়মূল্য ছিল। পূর্ববঙ্গেও ছিল

কাঁসা-পিতলের সমৃদ্ধ ব্যাবসা। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে বাসনের কদরও ছিল খুব। পশ্চিমবঙ্গেও কাঁসা-পিতলের ব্যাপক চল ছিল। এখনও বিহার, ওড়িশা, আসাম আর উত্তরপ্রদেশের কিছু অংশে কাঁসা-পিতলের ব্যবহার চোখে পড়ার মতো। বাংলাদেশে কাঁসা-পিতলের ব্যাবসা বহুদিনের। এর সঠিক সাল-তারিখ নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। কলকাতার বাজারেও একশো-দেড়শো বছরের পুরানো কাঁসা-পিতলের কারবারিরা রয়েছেন। চন্দ্রকুমার, গোঁসাইদাস কুণ্ডু, জীবনকৃষ্ণ কুণ্ডু, জয়দেব, নিত্যলাল প্রামাণিক, শশিভূষণ, প্রভাপদ দে প্রমুখ বহুদিনের ব্যবসায়ী। এখনও বিয়ে, অন্নপ্রাশন, তত্ত্ব-তালাশ, প্রিয়জনকে উপহার দেওয়ায় খাগড়াই বাসনের ঐতিহ্য রয়েছে।

কাঁসা-পিতলের ব্যাবসায় ভালো কারিগরের অভাব না থাকলেও উপযুক্ত শিক্ষা, বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগের অভাবের কারণেই তাঁদের নাম কেউ জানেন না কিংবা কখনও তাঁদের নিয়ে কোনো গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হয়নি। তবু, নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই হারিয়ে যেতে-বসা শিল্পটিকে পুনরুদ্ধার করার প্রয়োজন রয়েছে। সরকার এই শিল্পকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। বাঁকুড়ায় খুচরো ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে রোলিং প্ল্যান্ট খোলা হয়েছে, কয়েকটি কো-অপারেটিভ সোসাইটি গড়ে উঠেছে। সুবিধাজনক দামে কাঁচামাল সরবরাহ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। বাঁকুড়ায় একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সরকারি নিয়ন্ত্রণে এই শিল্পের বাজার তৈরি হলে শিল্পীরা অনেক বেশি সুবিধা পেতে পারেন। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবস্থা গৃহীত হলে শিল্পীরা আরও সুন্দর জিনিস গড়তে পারবেন। এক্ষেত্রে প্রয়োজন গ্রামীণ ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক বা সরকারি ব্যাংক ঋণ ও আর্থিক সহায়তা, কাঁচামাল সরবরাহের সুবিধা তৈরি করা, বাইরে থেকে আমদানির সুযোগ বৃদ্ধি, দেশে ও বিদেশের প্রদর্শনীতে তৈরি জিনিস দেখানো ও বিক্রির ব্যবস্থা করা। মনে রাখতে হবে—

(১) এই শিল্পের হাত ধরেই অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে—কেননা এই শিল্পে প্রচুর দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।

(২) এটি একটি অল্প পুঁজিভিত্তিক কর্মোদ্যোগ।

(৩) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গ্রামীণ অর্থনীতি এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে।

(৪) এই শিল্প স্বনির্ভর কর্মসংস্থান সৃষ্টির সহায়ক।

দারিদ্র্যের চাপে যেন শিল্পীরা তাঁদের নৈপুণ্য হারিয়ে না ফেলেন, পূর্বপুরুষের স্মৃতিবিজড়িত ব্যাবসায় থাকা মানুষের যেন তাঁদের উৎসাহ বা উদ্যম না হারান, যেন কারিগরের অভাব এই শিল্পে কখনও না ঘটে। শুধু সরকারের উদ্যোগই এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়, গ্রাম-শহর নির্বিশেষে সকল মানুষকে এই প্রচেষ্টায় অংশ নিতে হবে।

❋ **বিতর্কের আদলে বিষয় এবং তার পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু যুক্তি দেওয়া থাকবে। পরীক্ষার্থীকে প্রতিপক্ষের যুক্তির অসারতা প্রমাণ করে স্বপক্ষের যুক্তিক্রম বিন্যাস করতে হবে।**

- বিতর্কমূলক রচনায় যুক্তি-প্রতিযুক্তি সাজিয়ে মতের পক্ষে বা বিপক্ষে নিজের বক্তব্যকে অল্প কথায় লিখতে হবে।
- কোনো একটি নির্দিষ্ট মতের পক্ষে বা বিপক্ষেই কেবল যুক্তি সাজাতে হবে।
- প্রদত্ত অংশের বক্তব্যের বিরোধিতা করে, তার অসারতা স্পষ্ট করে নিজের মতটিকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বিনয় ও ঔদার্যের সঙ্গে কাজটি করতে হবে।
- কখনই যেন রচনাটি ব্যক্তিগত আক্রমণের পর্যায়ে না যায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।
- পরীক্ষার খাতায় নির্দিষ্ট বাক্যসংখ্যার মধ্যেই নিজ-নিজ যুক্তি সাজাতে হবে।
- আগেই বলা হয়েছে ব্যক্তিগত মতামত, ভাবাবেগ, বিশ্বাস বা সংস্কার নয়, যুক্তিই এক্ষেত্রে সর্বাগ্রগণ্য। তারই সঙ্গে বিন্যাসের পরিকল্পনা এবং প্রকাশের চমৎকারিত্ব বিতর্ককে করে তোলে স্বাদু ও মনোগ্রাহী।

নমুনা :

বিতর্কের বিষয় : ক্রিকেটের টি-টোয়েন্টি সংস্করণ খেলাটির মর্যাদা ও জনপ্রিয়তাকে ক্ষুণ্ণ করেছে।

মতের পক্ষে :

টি-টোয়েন্টি মূলত ‘ধর তক্তা মার পেরেক’ গোত্রের খেলা। টেস্ট এমনকি পঞ্চাশ ওভারের ম্যাচেও যেভাবে ধৈর্য, অধ্যবসায়, মনঃসংযোগ, ক্রিকেটীয় বুদ্ধি, শারীরিক সক্ষমতা এবং সর্বোপরি টেকনিকের পরীক্ষা হয়, তা যেন টি-টোয়েন্টিতে অনুপস্থিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্রীড়ানৈপুণ্য নয়, বরং ভাগ্যের জোরেই খেলার ফল স্থির হচ্ছে। এর ফলে অধিকাংশ ব্যাটস্‌ম্যানও আর টেকনিকের দিকে নজর না দিয়ে মারকাটারি ব্যাটিং-এর দিকে ঝুঁকে পড়ছেন। এর ফলে পিঞ্চ হিটারদের সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু প্রকৃত ব্যাটিং শিল্প অবলুপ্ত হচ্ছে। বোলিং-এর ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। মূলত ব্যাটস্‌ম্যানদের খেলা হওয়ায় বেশিরভাগ সময়েই বোলারদের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় কোনোমতে রান আটকানো, প্রয়োজনে নেগেটিভ বোলিং করেও। এইসব কারণেই যোগ্য টিম নয়, একটা ওভারের স্পেলে সমস্ত

হিসেবনিকেশ বদলে অযোগ্য টিমও অক্লেশে জিতে যেতে পারে। এমনিতেই এখন ক্রিকেট-লিগের কারণে ক্রিকেটাররা কার্যত সারাবছরই খেলে চলেছেন। টাকার লোভে অতিরিক্ত ক্রিকেট স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের শারীরিক সক্ষমতায় থাবা বসাচ্ছে। অনেক ক্রিকেটার তো দেশের হয়ে ভালো খেলতে ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হলেও আই পি এল বা অন্যত্র বিভিন্ন ক্লাবের হয়ে নিয়মিত ভালো খেলছেন। এর কারণ নিশ্চয়ই লোভনীয় অর্থমূল্য। আর এই কোটি কোটি টাকার লেনদেনের কারণেই টি-টোয়েন্টি এবং প্রিমিয়ার লিগগুলি ঘিরে তৈরি হয়েছে বেটিং, স্পট ফিক্সিং প্রভৃতি ক্রিকেটজুয়ার বিভিন্ন অভিযোগ। আবার অন্যদিকে স্বচ্ছতা ও সত্যনিষ্ঠার হদ্দমুদ্দ দেখাতে যেভাবে টিভিতে খেলোয়াড়দের নিলাম করা দেখানো হয়, গোরু-ছাগলের মতো যেভাবে তাদের কেনাবেচা হয়—তাও নিতান্ত কুরুচিকর এবং আপত্তিজনক। খেলোয়াড়রাও দেশপ্রেম বা এইরকম কোনো বৃহৎ আদর্শ থেকে নয়, টাকা কামাতেই মাঠে নামছেন। টি-টোয়েন্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁদের চটজলদি অনেক টাকা উপার্জনের মূল মঞ্চ। সব মিলিয়ে ক্রিকেটের 'জেন্টলম্যানস্ গেম' বা ভদ্রলোকের খেলা বলে যে সুনাম ছিল তা ইতিপূর্বেই ধূল্যবলুণ্ঠিত। এই কারণেই ক্রিকেটের জনপ্রিয়তাও তলানিতে এসে ঠেকেছে। অত্যধিক ক্রিকেট, বেটিং, খেলোয়াড়দের মান এবং মানসিকতার পরিবর্তন—এই সবই এর জন্য দায়ী। আগে যেভাবে ক্রিকেট ময়দানে ভারতের খেলা থাকলে আপামর ভারতবাসী সাগ্রহে টিভির সামনে বসে থাকত, এখন তা দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। টি-টোয়েন্টি এবং তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বিভিন্ন উপদ্রবগুলি বন্ধ না করলে এই অনাগ্রহ আরও বাড়বে বই কমবে না বলেই মনে হয়। হয়তো এমনও দিন আসবে যখন ক্রিকেট শব্দটা লেখা থাকবে কেবলমাত্র ইতিহাসের বইতে, আর এটাও থাকবে যে, খেলাটার কফিনে শেষ পেরেকটা পুঁতেছিল ওই খেলারই নবতম সংস্করণ—টি-টোয়েন্টি।

মতের বিপক্ষে :

নতুন যে-কোনো কিছুর বিরুদ্ধেই সংরক্ষণকারীরা রে-রে করে ওঠেন, এটাই দস্তুর। যখন প্রথম ওয়ান ডে ম্যাচ শুরু হয়েছিল, তখনও গোঁড়ারা ক্রিকেট খেলার জাত গেল বলে প্রচুর চিৎকার করেছিলেন। কালক্রমে কিন্তু টেস্টের জায়গায় ওয়ান ডে ম্যাচই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। বস্তুত আজকের এই প্রচণ্ড দ্রুত গতির পৃথিবীতে পাঁচদিন ধরে টেস্ট, এমনকি গোটা দিন ধরে পঞ্চাশ ওভারের ওয়ান ডে ম্যাচ দেখার সময় বের করা দুঃসাধ্য। সময়ের দাবি মেনে ফুটবল, টেনিস, রাগবি বা অন্যান্য খেলার মতোই ক্রিকেটকেও হয়ে উঠতে হয়েছে সংক্ষিপ্ত এবং আরও উত্তেজক। তা না করে ক্রিকেটের অতীত গৌরব রোমন্থন ও বেদনাবিলাসে খেলাটিরই অস্তিত্ব সংকট যে হতো না, কে বলতে পারে। তাছাড়া কেবলমাত্র

আই সি সি স্বীকৃত কয়েকটি মাত্র দেশের মধ্যে খেলা না হয়ে টি-টোয়েন্টি যে প্রিমিয়ার লিগের জন্ম দিয়েছে তাও খুব তাৎপর্যপূর্ণ। ফুটবল বা টেনিসের মতোই বিভিন্ন লিগ এবং ক্লাব বা ফ্র্যাঞ্চাইজির কল্যাণে ক্রিকেটও অনেক ছড়াতে পারছে। অনেক দক্ষ খেলোয়াড় সুযোগ পাচ্ছেন, দেশের জার্সি না পেয়েও অনেকেই আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেদের প্রতিভাকে মেলে ধরার সুবিধে পাচ্ছেন। ক্লাবের কল্যাণে বিভিন্ন দেশের ক্রিকেটাররা একসঙ্গে থাকছেন। মত বিনিময় ও বোঝাপড়া বাড়ছে। বিশেষত শিক্ষার্থী জুনিয়ারদের খুব সুবিধে হচ্ছে হাতের কাছেই আইকনদের পেয়ে। পিঞ্চ হিটাররা নিশ্চয়ই আছেন, কিন্তু এটাও প্রমাণিত যে টি-টোয়েন্টিতেও শেষ অবধি ক্লাস আর টেকনিকই শেষ কথা। আনাড়ি খেলোয়াড় দুমদাম ব্যাট চালিয়ে একবার দুবার রান পেতে পারেন, ধারাবাহিকতার জন্য কিন্তু সাধনার কোনো বিকল্প নেই। ক্রিকেটকে বলা হয় ‘মহান অনিশ্চয়তার খেলা’। টি-টোয়েন্টির একটা ওভারে পরপর কয়েকটি ওভার বাউন্ডারি বা উইকেট খেলার রং-ই নিমেষে বদলে দিতে পারে। সেইদিক থেকে অন্যান্য সংস্করণের থেকেও টি-টোয়েন্টিই সর্বাপেক্ষা উত্তেজক ও রোমহর্ষক সন্দেহ নেই। টেস্ট ক্রিকেটের মতো ধৈর্য প্রয়োজন না হলেও ক্রিকেটীয় মস্তিষ্ক, শারীরিক সক্ষমতা বা টেকনিকের আবশ্যিকতা টি-টোয়েন্টিতে কিছু কম নয়, টি-টোয়েন্টিই দর্শককে আবার মাঠে ফেরাচ্ছে। খেলোয়াড়দের নিলাম অন্যান্য খেলাতেও হয়। বরং প্রকাশ্যে গণমাধ্যমে এর সম্প্রচার স্বচ্ছতা এবং ভক্ত-সমর্থকদের কাছ থেকে বিশ্বাসযোগ্যতাই বাড়বে। বেটিং বা স্পট ফিক্সিং আগেও ক্রিকেটকে কলঙ্কিত করেছে, টি-টোয়েন্টিকেই একা দোষী ভাবার কোনো কারণ নেই। আর প্রশাসক বা খেলোয়াড়রা জড়িত থাকলেও তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। কয়েকজন খারাপ মানুষের জন্য গোটা খেলাটাকেই কাঠগড়ায় তোলার কোনো মানে হয় না। আর ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা বা বিশ্বাসযোগ্যতা কমেছে বলে যে প্রচার করা হচ্ছে তারও কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। জনপ্রিয়তা কমলে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বা আই পি এল ঘিরে কোটি কোটি টাকার বিজ্ঞাপনী স্বত্ব ও ব্র্যান্ড এনডোর্সমেন্টের বিষয়টা চলত না। স্পোর্টস চ্যানেলগুলির টি আর পি-ও অনেক কম থাকা উচিত ছিল। আশি-নব্বইয়ের দশকে মনোরঞ্জনের বিকল্প ব্যবস্থা ছিল না বলেই লোকে বাধ্যতামূলকভাবে হাঁ করে টিভিতে খেলা দেখত। আজকের যুগে অজস্র ও বিচিত্র বিনোদনের সুযোগের মধ্যেও লোকে ক্রিকেট দেখছে মূলত টি-টোয়েন্টির আকর্ষণেই। এককথায় ক্রিকেট খেলাটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে শেষ অবধি এর সংক্ষিপ্ততর সংস্করণের দিকেই জোর দিতে হবে। দুর্নীতি ও অন্যান্য সমস্যা নিশ্চয়ই কেটে যাবে, উত্তেজনা ও মনোরঞ্জনে ভরপুর টি-টোয়েন্টিই হয়ে উঠবে ক্রিকেটের একমাত্র সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ রূপ।

❋ কোনো একটি বিষয়ে নানা ধরনের সূত্র ও তথ্য দেওয়া থাকবে। সেগুলিকে ব্যবহার করে পরীক্ষার্থী রচনাটি গড়ে তুলবে।

- প্রদত্ত তথ্যসূত্রগুলি ভালো করে পড়ে নিতে হবে।
- প্রবন্ধ রচনার স্বার্থে তথ্যগুলি কীভাবে সাজিয়ে নিলে ভালো হয়, তা ঠিক করে নিতে হবে।
- প্রয়োজনে অতিরিক্ত তথ্য সংযোজন করা যেতে পারে।
- মৌলিক ভাবনা প্রকাশের পাশাপাশি রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিও ব্যবহার করা যেতে পারে।
- বিষয় অনুসারে প্রবন্ধটির যথাযথ একটি শিরোনাম দিতে হবে।

নমুনা :

উস্তাদ বিলায়েত খাঁ

- জন্ম : ২৮ আগস্ট ১৯২৮
- পিতামহ : উস্তাদ ইমদাদ খাঁ (সেতার ও সুরবাহার বাজাতেন; এঁর নামেই ঘরানার নাম ইমদাদি ঘরানা)
- পিতা : উস্তাদ এনায়েত খাঁ
- পিতার কাছে তালিম শুরু পাঁচ বছর বয়সে।
- আট বছর বয়সে 'অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স'-এ প্রথম প্রকাশ্যে সেতারবাদন। এরপরেই পিতার মৃত্যু।
- কাকা ওয়াহিদ খাঁর কাছে তালিম।
- মায়ের পরামর্শে গায়ক হবার পথ ছেড়ে সেতারে মনোনিবেশ।
- ইমন, টোড়ি, শ্রী, দরবারি, ভৈরবী রাগ বাদনে বিশেষ খ্যাতি।
- সৃষ্টি করেছেন এনায়েতখানী কানাড়া, সাঁঝস্বরাবলি, কলাবন্তী, মাণ্ড ভৈরব।
- সংগীত পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়ের 'জলসাঘর', ইংরেজি ভাষায় 'দ্য গুরু' এবং মধুসূদন কুমারের হিন্দি ছবি 'কাদম্বরী'। 'জলসাঘর'-এর সংগীত পরিচালনার জন্য পেয়েছিলেন প্রথম মস্কো ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের রৌপ্যপদক।

- উত্তরাধিকার : পুত্রদ্বয় সুজাত খাঁ ও হিদয়াত খাঁ, পণ্ডিত অরবিন্দ পারিখ, কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়, কল্যাণী রায়, বেঞ্জামিন গোমিন, লক্ষ্মী শেষণ, জিম সুলিভান।
- পেয়েছেন ১৯৬৪ সালে পদ্মশ্রী (প্রত্যাখ্যাত), ১৯৬৮ সালে পদ্মভূষণ (প্রত্যাখ্যাত), ২০০০ সালে পদ্মবিভূষণ (প্রত্যাখ্যাত), আফতাব-ই-সেতার ও ভারত সেতার সম্রাট পুরস্কার।
- মৃত্যু : ১৩ মার্চ ২০০৪।

আমি একটা অদ্ভুত লিরিজিসম পাই ওর বাজনায়—একটা রোমান্টিক অ্যাপ্রোচ, একটা বয়্যান্সি এবং ভিগার আছে। এই যে combination of romanticism and buoyancy, এটাই আসল জোর ওর বাজনায়! টেক্‌নিক্যালিও অপূর্ব। তার কারণ এত পরিষ্কার ওর হাত, তানগুলো এত স্পষ্ট, তানের সঙ্গে মিড়ের যোগ করে যেটাকে ও 'গায়কী অঙ্গ' বলে প্রচার করে, তার এফেক্ট দারুণ সুন্দর হয়, বড়ো ভালো লাগে।...অত্যন্ত স্পষ্ট ঝালা। ...ওর সম্বন্ধে একটা কথাই বলতে পারি—ও খুব বড়ো আর্টিস্ট।

—পণ্ডিত রবিশঙ্কর

সেতার-সম্রাট উস্তাদ বিলায়েত খাঁ

ভারতের সংগীতজগতের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র উস্তাদ বিলায়েত খাঁর সংগীতচর্চার মাধ্যম ছিল সেতার এবং সেতারে তিনি ছিলেন অবিসংবাদী সম্রাট। পণ্ডিত রবিশংকর ছাড়া সেতারবাদনে বিলায়েতের তুলনা এ পৃথিবীতে নেই। আমাদের কাছে তিনি আরও গর্বের কারণ এই কলকাতাতেই তাঁর সংগীতজীবনের সূত্রপাত, বিকাশ ও পরিণতি।

বিলায়েত খাঁ সম্বন্ধে বলার আগে অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন তাঁর পিতা এনায়েত খাঁ এবং পিতামহ ইমদাদ খাঁ-র নাম। এই দুজনেই ছিলেন সেতার ও সুরবাহারে অত্যন্ত দক্ষ শিল্পী এবং এ কারণেই তাঁদের বাজনার ধরনকে 'ইমদাদী ঘরানা' বলে চিহ্নিত করা হয়। সংগীতে সমর্পিত এই পরিবারেই ১৯২৮ সালে ২৮ আগস্ট বিলায়েত খাঁর জন্ম। বাবার কাছে তালিম শুরু করেন বছর পাঁচেক বয়সে। মাত্র আট বছর বয়সেই 'অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স'-এ প্রথম প্রকাশ্যে সেতার বাজান এবং সংগীতরসিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। কিন্তু তারপরেই মারা যান তাঁর পিতা এনায়েত খাঁ। এনায়েত খাঁর অনুপস্থিতিতে কাকা ওয়াহিদ খাঁর তত্ত্বাবধানে রেওয়াজ চলতে থাকে। বিলায়েত খাঁর সংগীতজীবনে তাঁর মায়ের প্রভাবও অত্যন্ত গভীর, মূলত তাঁর পরামর্শেই গায়ক হওয়ার পথ থেকে সরে এসে বিলায়েত সেতারে মন দেন।

বিলায়েত খাঁ মারা গেছেন ৭৫ বছর বয়সে, ২০০৪ সালের ১৩ মার্চ। ৮ বছর থেকে ৭৫ বছর—এই দীর্ঘ ৬৭ বছরের সেতার-জীবনে তিনি রেখে গেছেন একের পর এক মাইলস্টোন। তিনি ভারতীয় মার্গসংগীতের ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেও রীতি ও ভাবনায় নতুনত্ব এনেছেন ইমন, টোড়ি, শ্রী, দরবারি ও ভৈরবী রাগের ক্ষেত্রে। বেশ কয়েকটি রাগ তিনি নিজে তৈরি করেছেন, যেগুলির মধ্যে এনায়েতখানী কানাড়া, সাঁঝস্বরাবলি, কলাবন্তী, মাণ্ড ভৈরব উল্লেখযোগ্য। চলচ্চিত্রের সংগীত-পরিচালনার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান মনে রাখার মতো। সত্যজিৎ রায়ের 'জলসাঘর', ইংরেজি ভাষায় 'দ্য গুরু' এবং মধুসূদন কুমারের হিন্দি ছবি 'কাদম্বরী'—এই তিনটি সিনেমায় তাঁর সংগীতের প্রয়োগ অবিস্মরণীয়। 'জলসাঘর'-এর সংগীত পরিচালনার জন্য পেয়েছিলেন প্রথম মস্কো ইন্টারন্যাশনাল ফিল্‌ম ফেস্টিভ্যালের রৌপ পদক।

উস্তাদ বিলায়েত খাঁর সেতার বাদন সম্পর্কে পণ্ডিত রবিশঙ্কর বলেছিলেন, 'আমি একটা অদ্ভুত লিরিসিজম পাই ওর বাজনায়—একটা রোমান্‌টিক অ্যাপ্রোচ, একটা বয়্যান্সি এবং ভিগার আছে। এই যে combination of romanticism and buoyancy, এটাই আসল জোর ওর বাজনায়! টেক্‌নিক্যালিও অপূর্ব। তার কারণ এত পরিষ্কার ওর হাত, তানগুলো এত স্পষ্ট, তানের সঙ্গে মিড়ের যোগ করে যেটাকে ও 'গায়কী অঙ্গ' বলে প্রচার করে, তার এফেক্ট দারুণ সুন্দর হয়, বড়ো ভালো লাগে।...অত্যন্ত স্পষ্ট ঝালা। ...ওর সম্বন্ধে একটা কথাই বলতে পারি—ও খুব বড়ো আর্টিস্ট।' এই 'গায়কী অঙ্গ' অর্থাৎ বিভিন্ন গায়ন পদ্ধতি যেমন খেয়াল, ঠুমরি ইত্যাদি চলনকে সেতারে নিয়ে আসার মধ্যেই বিলায়েত খাঁর বাজনার বৈশিষ্ট্য লুকিয়ে আছে।

বিলায়েত খাঁর বাজনার ধারা আজও বহমান তাঁর দুই পুত্র উস্তাদ সুজাত খাঁ ও হিদয়াত খাঁর মধ্যে দিয়ে। পুত্ররা ছাড়াও তিনি তালিম দিয়েছেন উস্তাদ ইমরত খাঁ, পণ্ডিত অরবিন্দ পারিখ, কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়, কল্যাণী রায়, রেঞ্জামিন গোমিন, লক্ষ্মী শেসন, বিখ্যাত ইংরেজ সংগীতকার জিম সুলিভানকে।

ভারতের সংগীতজগতের এই মহান স্রষ্টার খ্যাতি ও সাফল্যের পাশাপাশি বিতর্কও একটা বড়ো জায়গা জুড়ে আছে। ১৯৬৪ সালে 'পদ্মশ্রী' ও ১৯৬৮ সালে 'পদ্মভূষণ' তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ তিনি মনে করেন যে তাঁর সংগীতকে বোঝার মতো কোনো ব্যক্তি এইসব কমিটিতে থাকে না। ২০০০ সালে 'পদ্মবিভূষণ' দেওয়া হলে তিনি তাও প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি সংগীত নাটক আকাদেমি পুরস্কারও ফিরিয়ে দেন। শুধু 'আফতাব-ই-সেতার' (সেতারের সূর্য) এবং 'ভারত সেতার সম্রাট' সম্মান তিনি গ্রহণ করেছিলেন। সংগীতজগতে রাজনীতি নিয়ে তিনি সারাজীবনই সোচ্চার ছিলেন।

ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে ২০০৪ সালে তিনি মারা যান। কিন্তু সারাজীবনের দীর্ঘ সাধনা তাঁকে সংগীতজগতের এক উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের আসন দিয়েছে। সেতার হাতে তিনি যেন সত্যিই ভারত-সম্রাট।

কবি, লেখক, নাট্যকার পরিচিতি

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৮৩): জন্ম ১৯৩৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর। সাবেক মানভূম জেলা, এখন বর্ধমানের রোপোগ্রামে। বাবা ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মা লক্ষ্মীরানী বন্দ্যোপাধ্যায়। কুলটি হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক, বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে আই এস সি এবং কলকাতার মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ থেকে বিএ। পরে ইংরেজিতে স্পেশাল অনার্স পাশ। শিক্ষকতা করেছেন প্রথম দমদমের মতিলাল বিদ্যায়তনে এবং পরে বাগুইহাটির হিন্দু বিদ্যাপীঠে। ছাত্রজীবন থেকে অজিতেশ নাটক রচনা ও অভিনয়ে আগ্রহী। ১৯৫৪ সালে লিখেছেন মৌলিক পূর্ণাঙ্গ নাটক 'সংঘাত'। ১৯৫৬ সালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘে যোগ দেন। ১৯৬০-এর ২৯ জুন প্রতিষ্ঠা করেন 'নান্দীকার'। এই নাট্যদলের ৩৪টি নাটকে অজিতেশ রূপান্তর/নির্দেশনা/অভিনয়সূত্রে যুক্ত ছিলেন। নাটকগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রযোজনা অবিস্মরণীয়। যেমন, 'সেতুবন্ধন', 'চার অধ্যায়', 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র', 'নানারঙের দিন', 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী', 'যখন একা', 'শের আফগান', 'তিন পয়সার পালা', 'নটী বিনোদিনী', 'ভালোমানুষ', 'আন্তিগোনে', 'সওদাগরের নৌকা' ইত্যাদি। ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ 'নান্দীমুখ' নামে নতুন নাট্যগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেন। এদের বিখ্যাত প্রযোজনা তলস্তয়ের পাওয়ার অফ ডার্কনেস অবলম্বনে রূপান্তরিত নাটক 'পাপপুণ্য'। পেশাদারি মঞ্চে অজিতেশ 'থানা থেকে আসছি', 'বাঘিনী' ও 'এই অরণ্যে' নাটকে অভিনয় করেছেন। বাংলা ও হিন্দি মিলে ৫০টিরও বেশি সিনেমায় অভিনয় করেছেন। যেমন, 'অতিথি', 'ছুটি', 'মহাবিপ্লবী অরবিন্দ', 'হাটেবাজারে', সাগিনা মাহাতো', 'এক আধুরী কহানি' ইত্যাদি। বেতারে ও দুরদর্শনে বহু নাটকের প্রযোজনা, নির্দেশনা ও অভিনয়ে ছিলেন অজিতেশ। যাত্রা করেছেন। সুর দিয়েছেন। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৌলিক ও রূপান্তরিত নাটকের সংখ্যা ২৬। এদের মধ্যে আছে 'সওদাগরের নৌকা', 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী, 'ভালোমানুষ', 'পাপপুণ্য', 'সাঁওতাল বিদ্রোহ', 'মুদ্রারাক্ষস'। বাংলা নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতির প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হয় বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস'। নাটকের নির্দেশনা ও অভিনয়ে ছিলেন অজিতেশ। এই বিপুল ব্যস্ততার মধ্যেই তিনি লিখেছেন উপন্যাস 'ভালো লেগেছিল'। বহু প্রবন্ধ ও ছোটোগল্প লিখেছেন, অনুবাদ করেছেন কবিতা। অজিতেশ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছাড়াও মস্কো নিউজ ক্লাব ক্রিটিক সার্কল অব ইন্ডিয়া, দিশারী, রঙ্গসভা ইত্যাদি বহু সংস্থা কর্তৃক পুরস্কৃত হন। লাভ করেন সংগীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার। ১৯৮০ সালের ১৪ অক্টোবর তিনি আকস্মিকভাবে প্রয়াত হন।

কর্তার সিং দুগ্‌গাল (১৯১৭-২০১২) : জন্ম রাওয়ালপিন্ডি জেলার ধমিয়ালে (বর্তমানে পাকিস্তান)। বাবা জীবন সিং দুগ্‌গাল, মা সতওয়ান্ত কউর। সাহোরের ফরম্যান ক্রিশ্চান কলেজ থেকে ইংরেজিতে এমএ। ১৯৪২-এ আকাশবাণীতে যোগ দেন। 'আকাশবাণী'র অধিকর্তার পদ থেকে অবসর নেবার পর 'ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট'-এর অধিকর্তা (১৯৬৬-৭৩) ছিলেন। যোজনা কমিশনের উপদেষ্টা (১৯৭৩-৭৬) রূপেও কাজ করেছেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালের পাঞ্জাবি সাহিত্যের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক দুগ্‌গাল কবি হিসেবে লেখক-জীবন শুরু করেন। পরে কবিতা লেখা কমিয়ে দিয়ে গদ্যের দিকে মনোযোগ দেন। কবিতা, ছোটোগল্প, উপন্যাস, নাটক, সাহিত্য-সমালোচনা—সাহিত্যের সব মাধ্যমেই তিনি লিখেছেন। মূলত মাতৃভাষা পঞ্জাবিতে লেখার পর বহুভাষাবিদ লেখক সেগুলি নিজেই হিন্দি, উর্দু আর ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। সাহিত্যিক হিসেবে কর্তার সিং দুগ্‌গালের প্রতিষ্ঠা সর্বভারতীয়। সাহিত্য অকাদেমি (১৯৬৫), গালিব পুরস্কার (১৯৭৬), সোভিয়েত ল্যান্ড নেহরু পুরস্কার (১৯৮১), ভাই বীর সিং পুরস্কার (১৯৮৯) ছাড়াও পেয়েছেন পদ্মভূষণ (১৯৮৮); তাঁর বেশ কিছু গল্প-উপন্যাস বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্জাবি বিভাগে পাঠ্য। দুগ্‌গালের রচনা অনুদিত হয়েছে ভারতের প্রধান-প্রদান ভাষা ছাড়াও বেশি কিছু বিদেশি ভাষায়; বিশিষ্ট সাহিত্যিক হিসেবে অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন।

রচনাবলির মধ্যে আছে দুটি কাব্যগ্রন্থ : কন্ধে কন্ধে (১৯৪১), বন্ধ দরওয়জে (১৯৫৯)।

চব্বিশটি গল্প সংকলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : দঙ্গর (১৯৪৪), নাওয়ান ঘর (১৯৫১), পরে মেরে (১৯৬১), ইকছিট চাননদি (১৯৬৩), সোনার বাংলা (১৯৭৬), মিল পত্থর, মৌরিয়া শ্রেষ্ঠ কহানিয়া। দশটি উপন্যাসের মধ্যে

উল্লেখযোগ্য : হাল মুরিদাঁ দা (১৯৫৮), শরদ পুনম কি রাত (১৯৭৮)। সাতটি নাটকের বই এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য : ইর সিকর সিকর, সত নাটক, পুরানিয়া বোতলা, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। এ ছাড়া এক খণ্ড আত্মজীবনী, সাহিত্য-সমালোচনামূলক সাতটি বই লিখেছেন।

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) : জন্ম বরিশাল জেলা শহরে। পূর্বপুরুষের আদি নিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার পদ্মাতীরের গাউপাড়া গ্রাম। বাবা সত্যানন্দ দাশ। মা কুসুমকুমারী দেবী। বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয় থেকে ১৯১৫-য় ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯১৭-য় বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই এ উত্তীর্ণ হন। দু বছর পর কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্স-সহ বি এ পাশ করেন। এ বছর 'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকায় 'বর্ষ আবাহন' নামে তাঁর কবিতা ছাপা হয়। এই প্রকাশের মাধ্যমেই জীবনানন্দের সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ। ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম এ পাশ করেন। ১৯২২ খ্রি. কলকাতার সিটি কলেজে ইংরেজি বিভাগে 'টিউটর' পদে কর্মজীবন শুরু করে প্রায় তিরিশ বছর ধরে খুলনা-দিল্লি-বরিশাল-কলকাতার বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেছেন কিন্তু কোথাও স্থায়ী হতে পারেনি। সারা জীবন জীবিকার, অনিশ্চয়তার দুঃসহ কষ্ট ভোগ করেছেন জীবনানন্দ দাশ। অবশেষে হাওড়া গার্লস কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে। বিভাগীয় প্রধানও হন। দুর্ভাগ্যের বিষয় কিছুদিন পরেই পথ দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয় (১৯৫৪)।

রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান কবি জীবনানন্দ দাশ জীবৎকালে বিতর্কিত হয়েছেন বারবার। উপেক্ষিত হয়েছেন। প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। তবু তিনি অবিরাম লিখে গিয়েছেন। সমৃদ্ধ করেছেন বাংলা সাহিত্যকে। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'ঝরাপালক', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'মহাপৃথিবী', 'সাতটি তারার তিমির', 'বনলতা সেন', 'রূপসী বাংলা', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'। গল্প-উপন্যাসও লিখেছেন বিস্তর। যেমন 'নিরুপম যাত্রা', 'কারুবাসনা', 'জলপাইহাটি', 'প্রেতিনীর রূপকথা' ইত্যাদি। কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধগ্রন্থের নাম 'কবিতার কথা'। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে জীবনানন্দের 'লিটারারি নোটস'।

বের্টোল্ট ব্রেখ্ট (১৮৯৮-১৯৫৬) : জার্মানির বাভারিয়ার আউগসবুর্গের এক সম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রেখ্টের বাবা ছিলেন স্থানীয় কাগজ কারখানার অধিকর্তা। একটি মেডিক্যাল স্কুলে কিছুদিন পড়াশোনা করেন ব্রেখ্ট্। পরে একটি সামরিক হাসপাতালে কাজ পান। যুদ্ধ-ফেরত আহত সৈনিকদের সেবা করা ছিল তাঁর দায়িত্ব। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রেখ্ট 'লাইফ অব এডওয়ার্ড টু অব ইংল্যান্ড' নামে একটি নাটক লেখেন। রুশ বিপ্লবের পরবর্তী অধ্যায়ে বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণি সম্পর্কে তাঁর চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে 'দ্য থ্রি পেনি অপেরা' তাঁকে বিখ্যাত করে তোলে। নাটকের নায়ক ম্যাকিজুল ব্রেখ্টের ভাষায় 'বুর্জোয়া ডাকাত'। ব্রেখ্টের মতে, পুঁজিবাদী সমাজের 'মহান ও ইতিবাচক' নায়কের তত্ত্বটি একটি বিরাট ধাপ্পা। পুঁজিবাদী সভ্যতায় মানুষ প্রকৃতি ও নিজের সত্তা থেকে বিয়োজিত হয়েছে। তাই ব্রেখ্টের নায়কেরা খর্বাকৃতি, ছোটোমাপের মানুষ। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রেখ্ট প্রবাদপ্রতিম অভিনেত্রী হেলেনে ভাইগেলকে বিবাহ করেন। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে রাইখস্ট্যাগের অগ্নিকাণ্ডের পর জার্মানিতে নেমে এসেছিল মানব ইতিহাসের এক বর্বরতম অধ্যায়। ব্রেখ্ট সপরিবার দেশত্যাগী হন। ডেনমার্ক, সুইডেন, ফিনল্যান্ড এবং অবশেষে ক্যালিফোর্নিয়া। গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড এড়িয়ে ব্রেখ্ট দেশ থেকে দেশান্তরে পৌঁছেছেন। আর একের পর এক সৃষ্টি করে গেছেন তাঁর কালজয়ী নাটকগুলি। 'মাদার কারেজ', 'গ্যালিলিও', 'চক সার্কল', 'ডি টাগে', 'ডি মাসনাহ্‌মে', 'ডি মুট্টের', 'সিমোন মাশার', 'আরতুরো উই।' বের্টোল্ট ব্রেখ্টের 'এপিক থিয়েটার' নাট্যআঙ্গিক নিয়ে সারা পৃথিবী আলোড়িত হয়েছে। পুঁজিবাদের ভয়াবহ বিকার ও অবক্ষয়কে বিশ্লেষণ করার জন্য ব্রেখ্ট মহাকাব্যকে আশ্রয় করেছেন। এই মহাকাব্যিক পদ্ধতি রপ্ত করার জন্য তিনি সংস্কৃত নাটক পড়েছেন। মার্কস বুঝেছেন, চিনের পিকিং অপেরার কাছে গেছেন, জাপানের কাবুকি দেখেছেন।

মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬) : জন্ম অবিভক্ত ভারতবর্ষের ঢাকায়। পিতা কবি, সাহিত্যিক, প্রাক্তন ‘বর্তিকা’ সম্পাদক মণীশ ঘটক, কল্লোল যুগের ‘যুবনাশ্ব’। মাতা ধরিত্রী দেবী। মহাশ্বেতার শিক্ষাজীবন কেটেছেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে। দেশভাগের পর এপার বাংলায় চলে আসেন। বিশ্বভারতী থেকে ইংরেজিতে স্নাতক হন। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। অভিনেতা, নাট্যকার, লেখক, ভারতীয় গণনাট্য সংঘের অন্যতম পুরোধা বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিবাহ ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭।
মহাশ্বেতা দেবীর বিচিত্র কর্মজীবনের শুরু স্কুল শিক্ষকতা দিয়ে। পরে কিছু দিনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি। শেষপর্যন্ত বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজে ইংরেজির অধ্যাপকরূপে স্বেচ্ছায় শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণ। মহাশ্বেতা দেবীর প্রথম মুদ্রিত লেখা রবীন্দ্রনাথের ‘ছেলেবেলা’ গ্রন্থটি নিয়ে। যেটি ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় খগেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত ‘রংমশাল’ পত্রিকায়। প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ ‘ঝাঁসীর রাণী’ সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম উপন্যাস ‘নটী’ হুমায়ুন কবীর সম্পাদিত ‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে।
গল্প, উপন্যাস, অনুবাদ, জীবনী ইত্যাদি মিলে মহাশ্বেতা দেবীর বইয়ের সংখ্যা শতাধিক। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল: অরণ্যের অধিকার, কবি বন্দ্যঘটী গাঞ্চির জীবন ও মৃত্যু, অক্লান্ত কৌরব, চোট্টি মুণ্ডা ও তার তীর, তিতুমির, শ্রীশ্রীগণেশ মহিমা, হাজার চুরাশির মা ইত্যাদি। মহাশ্বেতা দেবী শুধু লেখালেখিতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। মানুষের লড়াইয়ে শামিল হয়েছেন। এই অভিজ্ঞতা তাঁর লেখাকে জীবনের স্বাদে ভরপুর করে তোলে। জীবনে বহু পুরস্কার ও সম্মান তিনি অর্জন করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম হলো : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত লীলা পুরস্কার, শরৎচন্দ্র স্মৃতি পদক; ভুবনমোহিনী পদক; জগত্তারিণী স্বর্ণপদক; অমৃত পুরস্কার; সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার (১৯৭৯); ভারত সরকার প্রদত্ত ‘পদ্মশ্রী’ (আদিবাসী ক্ষেত্রে কাজের জন্য ১৯৮৬); জ্ঞানপীঠ পুরস্কার; ম্যাগসেসে পুরস্কার ইত্যাদি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) : জন্ম সাঁওতাল পরগনার দুমকা শহরে। পৈতৃক নিবাস বিক্রমপুর, ঢাকা। প্রকৃত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিক তাঁর ডাকনাম। পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা নীরদা দেবী। পিতার চাকরিসূত্রে বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন স্কুলে তাঁর ছাত্রাবস্থা কেটেছে। পরে বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ান মিশন কলেজ থেকে আই এস সি পাশ করে অঙ্কে অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এসসি. পড়ার সময় ‘অতসীমামী’ (বিচিত্রা ১৯২৮) গল্প লিখে বাংলা সাহিত্যে তাঁর সাড়া জাগানো পদার্পণ।

প্রথম জীবনের দু-চার বছরের চাকরি ছাড়া সাহিত্যরচনাই ছিল তাঁর একমাত্র কাজ।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘জননী’ প্রকাশিত হয়। তাঁর রচির অন্যতম প্রধান উপন্যাসগুলির মধ্যে ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ ও ‘পদ্মানদীর মাঝি’ ধারাবাহিকভাবে ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত উপন্যাসগুলি হলো : ‘দিবারাত্রির কাব্য’, ‘ইতিকথার পরের কথা’, ‘শহরবাসের ইতিকথা’, হলুদ নদী, সবুজ বন, ‘জননী’, ‘চিহ্ন’, ‘মাশুল’ ইত্যাদি। মোহ ও সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে এই ঔপন্যাসিকের গল্প লেখার ধরনটিও ছিল অনন্য। লিখেছেন তিনশোর বেশি গল্প। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থগুলি হল ‘অসতীমামী ও অন্যান্য গল্প’, ‘প্রাগৈতিহাসিক’, ‘মিহি ও মোটা কাহিনী’, ‘সরীসৃপ’, ‘বৌ’, ‘সমুদ্রের স্বাদ’, ‘ভেজাল’, ‘হলুদপোড়া’, ‘আজ কাল পরশুর গল্প’, ‘পরিস্থিতি’, ‘খতিয়ান’, ‘ছোটবড়’, ‘মাটির মাশুল’, ‘ছোট বকুলপুরের যাত্রী’, ‘ফেরিওয়ালা’ ‘লাজুকলতা’ প্রভৃতি। ‘লেখকের কথা’ (১৯৫৭) তাঁর লেখা কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন।

মৃদুল দাশগুপ্ত : জন্ম ৩ এপ্রিল ১৯৫০, শ্রীরামপুরে। পিতা জ্যোৎস্না কুমার দাশগুপ্ত ও মাতা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত। প্রথমে পূর্ণচন্দ্র বিদ্যালয় ও পরে শ্রীরামপুর ইউনিয়ন ইন্সটিটিউটে শিক্ষালাভ। এরপর উত্তরপাড়ার প্যারীমোহন কলেজ থেকে জীবনবিজ্ঞানের স্নাতক। কলেজ জীবনেই কবিতা লেখা শুরু।

কিছুদিন শ্রীরামপুর ইউনিয়ন ইন্সটিটিউটে শিক্ষকতা করবার পর ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে পাকাপাকিভাবে সাংবাদিকতা শুরু করেন। প্রথমে *'পরিবর্তন'* সাপ্তাহিক এবং তারপর *'যুগান্তর'* পত্রিকায়। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে *'আজকাল'* পত্রিকায় যোগ দেন। এখনও সেই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

কবি মৃদুল দাশগুপ্ত 'বাইসন' ও 'শত জলঝর্নার ধ্বনি' নামে দুটি লিটল ম্যাগাজিনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। প্রথম কাব্যগ্রন্থ *'জলপাই কাঠের এসরাজ'*। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ—*'এভাবে কাঁদে না'*, *'গোপনে হিংসার কথা বলি'*, *'সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ'*, *'সোনার বুদ্বুদ'*। সংকলিত কবিতাটি *'ধানক্ষেত থেকে'* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

'কবিতার সহায়' ও *'সাত-পাঁচ'* নামে দুটি সদ্য সংগ্রহও প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া আছে ছড়ার বই *'আমপাতা জামপাতা'*, *'ছড়া পঞ্চাশ'* ও *'রঙিন ছড়া'*।

তিনি ন্যাশনাল রাইটার্স অ্যাওয়ার্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কার ও রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) : জন্ম জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। রবীন্দ্রনাথের পড়াশোনা চলত ঘরেই, মাধব পণ্ডিতের কাছে। প্রথম স্কুল ওরিয়েন্টাল সেমিনারি। তারপর বেঙ্গল একাডেমি, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল। কিন্তু স্কুলের পাঠ শেষ করতে পারেননি। স্কুলে প্রথাগত শিক্ষা না হলেও বাড়িতে গৃহশিক্ষকের কাছে জ্ঞানার্জনে কোনো ত্রুটি ঘটেনি। ছাপার অক্ষরে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'হিন্দু মেলার উপহার' (৩০ মাঘ ১২৮১)। কবির বয়স তখন ১৩ বছর ৮ মাস। ১৮ বছর বয়সের মধ্যে কবি 'বনফুল', 'কবিকাহিনী', 'ভানুসিংহের পদাবলী', 'শৈশব সংগীত' ও 'রুদ্রচণ্ড' রচনা করেন। 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' তাঁর প্রথম গদ্য প্রবন্ধ। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে রবীন্দ্রনাথ পিতার আদেশে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারি দেখতে গিয়ে প্রকৃতির সুন্দর পরিবেশ তাঁকে রচনায় অনুপ্রাণিত করে।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ইংল্যান্ড যান। এই সময় বিখ্যাত ইংরেজ শিল্পী রোদেনস্টাইন কবির ইংরেজি অনুবাদে কাব্যসংকলন 'গীতাঞ্জলি' (Song Offerings) পাঠ করে মুগ্ধ হন। এই গ্রন্থের জন্যই তিনি ১৩১৩-য় নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন। তিনিই প্রথম নোবেলজয়ী ভারতীয়। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, সুরকার, নাট্যপ্রযোজক, চিত্রকর ও স্বদেশপ্রেমিক। দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের (ভারত ও বাংলাদেশ) জাতীয় সংগীতের রচয়িতা তিনি। রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আছে 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'বলাকা', 'পুরবী', 'মহুয়া', 'আকাশপ্রদীপ', নবজাতক', রোগশয্যায়', 'আরোগ্য' ইত্যাদি। উপন্যাসের মধ্যে 'নৌকাডুবি', 'গোরা', 'যোগাযোগ', 'ঘরে-বাইরে', 'চতুরঙ্গ', 'চার অধ্যায়', 'শেষের কবিতা' ইত্যাদি। নাটকের মধ্যে 'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জন', 'রাজা', 'ডাকঘর', 'মালিনী', 'অরূপরতন', 'রক্তকরবী' ইত্যাদি। এছাড়া আছে অসংখ্য প্রবন্ধ, নৃত্যনাট্য, গল্প, চিঠিপত্র, স্মৃতিকথা ইত্যাদি।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩—১৯৯৫) : জীবনানন্দ পরবর্তীকালে অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবি। জন্মস্থান বহড়ু-দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা। কলকাতার কাশিমবাজার স্কুল থেকে পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। পরে কবি বুদ্ধদেব বসুর আমন্ত্রণে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্যগঠিত তুলনামূলক সাহিত্যে ভরতি হলেও কয়েকমাস পড়ে তা ছেড়ে

দেন। তৎকালীন 'ক্ল্যারিয়ন' বিজ্ঞাপন কোম্পানিতে কপিরাইটার হিসেবে তাঁর প্রথম চাকরি। এরপর 'ভারবি' প্রকাশনায়, যেখানে তাঁরই পরিকল্পনায় 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'-র সিরিজ প্রকাশিত হতে থাকে। এই সময়ে বন্ধু পৃথ্বিশ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় একটি টিউটোরিয়াল হোমও খোলেন। সে সময়ের তরুণ কবিদের একমাত্র মুখপত্র 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান প্রতিভা। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় 'যম' কবিতা লিখে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'কুয়োতলা' প্রকাশিত হয় যাতে তিনি তাঁর স্বগ্রামের উপভাষা ব্যবহার করেছিলেন। এর আগে তাঁর ছোটোগল্প 'নিরুপমের দুঃখ' প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর অপর দুই উপন্যাস 'দাঁড়াবার জায়গা' ও 'অবনী বাড়ি আছো?' একসময়ে 'রূপচাঁদ পক্ষী' ছদ্মনামে কলকাতা নিয়ে নিয়মিত ফিচার লিখেছেন। পরবর্তীকালে সম্পাদনা করেছেন 'কবিতা সাপ্তাহিকী'। তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ৫১। প্রণীত-অনূদিত-সম্পাদিত কবিতা ও গদ্যগ্রন্থের সংখ্যা ১১১। তাছাড়া অজস্র অগ্রন্থিত রচনা নানান পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে। অনুবাদ করেছেন 'মেঘদূত', ওমর খৈয়াম, গালিব, লোরকা, রিলকে প্রমুখের কবিতা। 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো' কাব্যগ্রন্থের জন্য পেয়েছিলেন সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার, ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে। এছাড়াও তিনি আনন্দ পুরস্কার, সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গঙ্গাধর মেহের পুরস্কার, মরণোত্তর রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হন। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : 'সোনার মাছি খুন করেছি', 'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান', 'ধর্মেও আছো জিরাফেও আছো', 'ছিন্নবিচ্ছিন্ন', 'প্রভু নষ্ট হয়ে যাই', 'পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি' প্রভৃতি। বিশ্বভারতীতে অতিথি-অধ্যাপক হিসেবে অধ্যাপনায় রত থাকাকালীন তিনি আকস্মিকভাবে প্রয়াত হন।

শম্ভু মিত্র (১৯১৫-১৯৯৭) : জন্ম কলকাতার ডোভার রোডে। বাবা শরৎকুমার মিত্র, মা শতদলবাসিনী দেবী। বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে পড়াশোনা। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভরতি হন। অভিনয়ের পাঠ নেন কৃষ্ণগোবিন্দ সরকারের কাছে। পেশাদার মঞ্চ রঙমহলে অভিনয় করেছেন 'মাটির ঘর', 'ঘূর্ণি', 'রত্নদীপ' নাটকে। ১৯৪১-এ যোগ দেন মিনার্ভা থিয়েটারে। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির শ্রীরঙ্গম মঞ্চে 'জীবনরঙ্গ', 'উড়ো চিঠি'-সহ পাঁচটি নাটকে অভিনয় করেন। ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের সময় রচনা করেন 'উলুখাগড়া' নাটক। ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক-শিল্পী সংঘের সঙ্গে যুক্ত হন। নবগঠিত ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বাংলা শাখার নাট্য সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৪-এর ৩ জানুয়ারি স্টার থিয়েটারে বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' নাটকের পরিচালনা। শ্রীরঙ্গম মঞ্চে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের 'নবান্ন' প্রথম অভিনীত হয়। পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন, অভিনয়ও করেন। খাজা আহমেদ আব্বাসের 'ধরতি কে লাল'-এর সহকারী পরিচালক। অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্রের সঙ্গে বিয়ে। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয় ১৯৪৭-এ। ১৯৫০-এর ১-লা মে, বহুরূপী নাট্যদলের প্রতিষ্ঠা। নাট্যপরিচালক পদে শম্ভু মিত্র। বহুরূপী প্রযোজিত প্রথম নাটক 'উলুখাগড়া'। দ্বিতীয় নাটক 'বিভাব' জাপানি কাবুকি নাটকের অভিনব রূপান্তর। রচনা ও পরিচালনা শম্ভু মিত্র। এরপর বহুরূপীর প্রযোজনায় একে একে মঞ্চস্থ হতে থাকে অবিস্মরণীয় নাটক, যা বাংলা নাটকচর্চাকে ঐতিহাসিক উচ্চতায় নিয়ে যায়। চার অধ্যায়, দশচক্র, যেমন, রক্তকরবী, ডাকঘর, পুতুল খেলা, মুক্তধারা, বিসর্জন, রাজা অয়াদিপাউস, রাজা, বাকি ইতিহাস, বর্বর বাঁশী ইত্যাদি। নাটক লেখা বা রূপান্তর, অভিনয় বা নির্দেশনা—কোনো-না-কোনোভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন শম্ভু মিত্র। বাংলা নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতির তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান প্রবক্তা। নাটক নিয়ে এই নিশ্ছিদ্র ব্যস্ততার মধ্যেই তিনি বহু চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন, সহকারীর দায়িত্ব পালন করেছেন। স্বনামে ও ছদ্মনামে লিখেছেন প্রবন্ধ, গল্প। সম্মানিত হয়েছেন সংগীত-নাটক আকাদেমি, ম্যাগসাইসাই, কালিদাস ইত্যাদি পুরস্কারে।

সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭) : জন্ম কলকাতার বাগবাজারে বিশ্বকোষ লেন-এর বাড়িতে। আদি নিবাস ঢাকা মানিকগঞ্জ, সুয়াপুর। পিতা অরুণচন্দ্র সেন। মাতা চন্দ্রমুখী দেবী ছিলেন বঙ্কিম-বান্ধব জগদীশনাথ রায়ের দৌহিত্রী। পিতামহ দীনেশচন্দ্র সেন ছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত লেখক ও ইতিহাস-প্রণেতা। সমর সেন পড়াশোনা করেছেন কাশিমবাজার পলিটেকনিক স্কুল, স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এম. এ. ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। কর্মজীবনের প্রথমে দু মাস কাঁথির প্রভাতকুমার কলেজে অধ্যাপনা করেন। দিল্লির অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো-য় কয়েক বছর নিউজ এডিটর হিসেবে কাজ করেছেন। তিনের দশকে কবিতা লেখা শুরু করেন। তাঁর কবিতার বিষয় ও রীতির বিশিষ্টতা বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'কবিতা' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক (১৯৩৪) খ্যাতির শীর্ষে থাকার সময় ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে হঠাৎই কবিতা লেখা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। নতুন কাব্যরীতি ও রোমান্টিকতাবর্জিত তীক্ষ্ণ ভাষাপ্রয়োগ সমর সেনের কবিতাকে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত করেছে। তাঁর কবিতা গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে *'গ্রহণ'*, *'নানাকথা'*, *'খোলা চিঠি'*, *'তিন পুরুষ'*। *'সমর সেনের কবিতা'* প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর কবিজীবন বিষয়ের গভীরতা ও বিস্তৃতিতে, প্রকাশগত তির্যকতায়, তীব্র নগরচেতনায় ও নাগরিক দার্শনিকতায় অভিনব। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'বাবু বৃত্তান্ত' ১৯৭৮-এ প্রকাশিত হয়। পরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সম্পাদকরূপে নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে তোলেন।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (১৯৩০-২০১২) : জন্ম মুর্শিদাবাদ জেলার খোশবাসপুরে। ১৯৪৬-এ বর্ধমান জেলার গোপালপুর মুক্তকেশী বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। স্নাতক হন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে। ছোটোবেলা থেকেই ছিল তাঁর বই পড়ার নেশা। ১৯৫০ সালে 'ইবলিশ' ছদ্মনামে প্রথম গল্প 'কাঁচি' প্রকাশিত হয় বহরমপুরের 'সুপ্রভাত' পত্রিকায়। ওই সালেই সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় 'শেষ অভিসার' কবিতা বেরোয়। ১৯৬২ সালে সাপ্তাহিক 'দেশ'-এ প্রথম প্রকাশিত গল্প 'ভালোবাসা ও ডাউন ট্রেন।' পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় কাজ করেন ১৯৬৪-১৯৬৯। 'আনন্দবাজার' পত্রিকা'র বার্তা বিভাগে স্থায়ী চাকরিতে যোগ দেন ১৯৭১ সালে। প্রায় পঁচিশ বছর তিনি এই পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস 'নীল ঘরের নটী' প্রকাশিত হয়, ১৯৬৬ সালে। সর্বস্তরের পাঠকের অভিনন্দন-ধন্য এই উপন্যাস। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ মিলিয়ে দুশো-র বেশি। ছোটোদের জন্য তাঁর লেখা রহস্য কাহিনির নায়ক প্রকৃতিবিজ্ঞানী কর্নেল নীলাদ্রি সরকার অত্যন্ত জনপ্রিয় চরিত্র। সামগ্রিক সাহিত্যকর্মের জন্য 'আনন্দ পুরস্কারে' সম্মানিত হন ১৯৭৯ সালে। 'অলীক মানুষ' উপন্যাসের জন্য 'সাহিত্য অকাদেমি', ভুয়ালকা পুরস্কার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'বঙ্কিম পুরস্কার' পান। ২০১০-এ পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার'। 'অমর্ত্য প্রেমকথা'র জন্য তিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিংহ দাস স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়াও তিনি সামগ্রিক সাহিত্যকৃতির জন্য পেয়েছেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুরস্কার, শরৎচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার। শৈলজানন্দ জন্ম শতবার্ষিকীতে পেয়েছেন শৈলজানন্দ স্মৃতি পুরস্কার। ১৯৮০ সালে তিনি আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে চার মাস আমেরিকায় ছিলেন। লেখা ও পড়ায় সমান নিষ্ঠা ছিল সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের। কথাসাহিত্যের সঙ্গে বেশ কিছু প্রবন্ধও লিখেছেন তিনি। অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের মনোজ্ঞ মিশেল তাঁর রচনাবলি। 'হিজলকন্যা', 'নিশিমৃগয়া', 'মায়ামৃদঙ্গ', 'স্রোতে ভেসে আছি' ইত্যাদি তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তাঁর লেখা বিখ্যাত ছোটোগল্পগুলির মধ্যে রয়েছে 'পদ্মবনে মত্ত হাতি', 'সাপ বিষয়ে একটি উপাখ্যান', 'মৃত্যুর ঘোড়া', 'কালুহাটির বৃত্তান্ত', 'বসন্তের বিকেলে ঘুমঘুমির মাঠে', 'সূর্যমুখী', 'ভারতবর্ষ', 'উড়ো পাখীর ছায়া', 'আত্মজ', 'বাদশা' প্রভৃতি।

পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যসূচি

বাংলা - ক পাঠক্রমের পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যসূচি

গল্প

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...... দুর্বুদ্ধি, বিদূষক, কর্তার ভূত

২. প্রেমেন্দ্র মিত্র ...... তেলেনাপোতা আবিষ্কার

৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ...... কে বাঁচায়, কে বাঁচে

৪. তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ...... স্বাধীনতা

৫. আশাপূর্ণা দেবী ...... ত্রাণকর্তা

৬. পরশুরাম ...... পরশপাথর

৭. সতীনাথ ভাদুড়ী ...... ডাকাতের মা

৮. বনফুল ...... বন্য মহিষ

৯. মহাশ্বেতা দেবী ...... ভাত

১০. সমরেশ বসু ...... পশারিণী

১১. সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ...... ভারতবর্ষ

১২. মতি নন্দী ...... অস্থায়ী পলায়ন

১৩. নরেন্দ্রনাথ মিত্র ...... লেখিকা

১৪. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ...... শাজাহান আর তার নিজস্ব বাহিনী

১৫. শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ...... সম্পূর্ণতা

প্রবন্ধ

১. হুতোম প্যাঁচা ...... ভূত নাবানো

২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ...... কমলাকান্তের জোবানবন্দী

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...... কৌতুকহাস্য, নবযুগ, বিদ্যার যাচাই, সভ্যতার সংকট

৪. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ...... জগতের শ্রেষ্ঠ বই

৫. আব্দুল জব্বার ...... ধানের নাম লক্ষ্মী

৬. সত্যেন্দ্রনাথ বসু ...... গালিলিও

৭. অশীন দাশগুপ্ত ...... রবি ঠাকুরের দল/সহিষ্ণুতার ইতিহাস

৮. সৈয়দ মুজতবা আলি ...... নেতাজী

৯.	কল্যাণী দত্ত	......	আম
১০.	কাজী নজরুল ইসলাম	......	ক্ষুদিরামের মা
১১.	নবনীতা দেবসেন	......	দামাস্কাসের গেট (অংশ)
১২.	স্বামী বিবেকানন্দ	......	সুয়েজখালে : হাঙর শিকার
১৩.	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	......	ঘরোয়া (অংশ)
১৪.	প্রমথ চৌধুরী	......	সুরের কথা
১৫.	বিনয় ঘোষ	......	হাসি
১৬.	শান্তিদেব ঘোষ	......	বাংলাদেশের যাত্রাভিনয়

ভারতীয় গল্প

১.	কর্তার সিংহ দুগ্‌গাল	......	অলৌকিক
২.	ইসমত চুগতাই	......	বাচ্চা

আন্তর্জাতিক গল্প

১.	গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ	......	বিশাল ডানাওয়ালা এক থুরথুরে বুড়ো
২.	আন্তন চেকভ	......	কেরানির মৃত্যু

কবিতা

১.	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	......	বীরাঙ্গনা, সনেট (বটবৃক্ষ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)
২.	লালন ফকির	......	বাড়ির কাছে আরশিনগর
৩.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	......	রুপনারানের কূলে/আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে/ প্রাণ/ ঝড়ের খেয়া/ আধোজাগা
৪.	কাজী নজরুল ইসলাম	......	বিদ্রোহীর বাণী, অরুনকান্তি কে গো, দ্বীপান্তরের বন্দিনী
৫.	জীবনানন্দ দাশ	......	শিকার, তিমির হননের গান, আলোপৃথিবী
৬.	অমিয় চক্রবর্তী	......	বিনিময়
৭.	বিষ্ণু দে	......	স্বহস্তে বাজাবে
৮.	বুদ্ধদেব বসু	......	বাবার চিঠি
৯.	সমর সেন	......	মহুয়ার দেশ
১০.	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	......	আমরা যাবো, পারাপার
১১.	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	......	দেশ দেখাচ্ছ অন্ধকারে

১২.	অরুণ মিত্র	......	তোমার মূর্তি আমি
১৩.	শঙ্খ ঘোষ	......	দ
১৪.	অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	......	নির্বাসন
১৫.	শক্তি চট্টোপাধ্যায়	......	আমি দেখি
১৬.	ভাস্কর চক্রবর্তী	......	জিরাফ
১৭.	মৃদুল দাশগুপ্ত	......	ক্রন্দনরতা জননীর পাশে
১৮.	জয় গোস্বামী	......	নুন
১৯.	মল্লিকা সেনগুপ্ত	......	সাম্প্রদায়িক
২০.	সুকান্ত ভট্টাচার্য	......	প্রিয়তমাসু

ভারতীয় কবিতা

১.	আইয়াপ্পা পানিকর	......	শিক্ষার সার্কাস
২.	মোহন ঠাকুরা	......	ঈশ্বরের খোঁজে

আন্তর্জাতিক কবিতা

১.	বের্টোল্ট ব্রেখট	......	পড়তে জানে এমন এক মজুরের প্রশ্ন
২.	ওয়ালট হুইটম্যান	......	ঘাস

পূর্ণাঙ্গ বই

১.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	......	গুরু
২.	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	......	আমার বাংলা

নাটক

১.	বিজন ভট্টাচার্য	......	আগুন
২.	শম্ভু মিত্র	......	বিভাব
৩.	অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়	......	নানা রঙের দিন
৪.	উৎপল দত্ত	......	ইতিহাসের কাঠগড়ায়
৫.	বাদল সরকার	......	ভুল রাস্তা
৬.	মনোজ মিত্র	......	মঞ্চে চিত্রে
৭.	মোহিত চট্টোপাধ্যায়	......	মাছি